স্বস্তিকা

দাম : দশ টাকা

৬৭ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা।। ২৯ ডিসেম্বর - ২০১৪।। ১৩ পৌষ - ১৪২১।। website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৭ বর্ষ ১৮ সংখ্যা, ১৩ পৌষ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ

২৯ ডিসেম্বর - ২০১৪, যুগাব্দ - ৫১১৬,

Website : www.eswastika.com

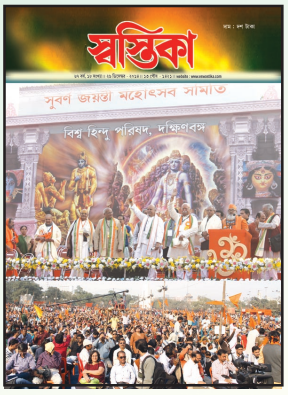

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬, ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

সাংবাদিকদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে খবর প্রকাশ বন্ধ করা যায় না ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

খোলা চিঠি : চোরের দিদির বড় গলা ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

ইসলামি সন্ত্রাস : পশ্চিমবাংলায় বিপন্ন হিন্দুত্ব ▯ দেবব্রত ঘোষ ▯ ১২

সন্ত্রাসবাদ ও অনুপ্রবেশ ▯ ড. প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় ▯ ১৫

সন্ত্রাস ও অর্থনীতি, কারণ ও ফলাফল ▯ অম্লানকুসুম ঘোষ ▯ ১৭

পরিবর্তনের গঙ্গাযাত্রা ▯ অম্লান মুকুর মিত্র ▯ ২০

রামাবতার : রাক্ষস সংস্কৃতির অবসান ▯ ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার ▯ ২১

পরিবার বটে, তবে জনতা ছাড়া ▯ নলিন এস কোহলি ▯ ২৭

গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল ▯ দেবাংশু ঘোড়ই ▯ ২৯

সন্ত্রাসবাদ ও অনুপ্রবেশ প্রশ্নে উদ্বিগ্ন অসম, পূর্বোত্তর ▯ ৩১

রানী গাইদিনলিউকে ভারতরত্ন ▯ ৩২

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ ▯ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** ▯ **অঙ্গনা : ২৬** ▯ **অন্যরকম : ৩৩** ▯ **সুস্বাস্থ্য : ৩৫** ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৮**▯ **খেলা : ৩৯** ▯ **শব্দরূপ : ৪০** ▯ **চিত্রকথা : ৪১** ▯ **প্রাসঙ্গিকী : ৪২**

প্রকাশিত হবে ৫ জানুয়ারি ২০১৫

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ৫ জানুয়ারি ২০১৫

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক

এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর মুখ দেখাদেখি প্রায় বন্ধ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা রাজ্যে এলেও মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের এড়িয়ে চলেন। এমনকি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাৎ পান না। কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের এই সংঘাতে রাজ্যের উন্নয়ন কি সম্ভব? পৃথক রাজনৈতিক দল কেন্দ্র ও রাজ্য শাসন করলেও উন্নয়নের প্রশ্নে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক জরুরি। লিখেছেন— **ড. ভাস্কর পুরকায়স্থ ও ভাস্কর ভট্টাচার্য।**

HB®

INDIA'S NO. 1 IN ISI MARKED HEAVY PIPE FITTINGS

HB® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

Authorised Distributor

NATIONAL PIPE & SANITARY STORES

54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833

3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803

Sister Concern

Partha Sarathi Ceramics

4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE® PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

সম্পাদকীয়

ধর্মান্তরকরণ নয়, পরাবর্তন চাই

নিজের ধর্ম চয়ন ও অনুশীলনের মৌলিক অধিকার সংবিধান স্বীকৃত। যুগযুগ ধরিয়া এই দেশের মানুষ শ্রদ্ধার সহিত সনাতন ধর্ম পালন করিয়া আসিতেছে। সনাতন ধর্মের নানা শাখাপ্রশাখা দর্শন থাকিলেও তাহা একই তরঙ্গে প্রবাহিত হইতেছে। এই প্রবাহেরই চলমান জীবনধারা হইতেছে হিন্দুত্ব। সুপ্রিম কোর্টের ভাষায় যাহা Way of Life বা জীবন পদ্ধতি। সাতশত বৎসর ধরিয়া ইসলামি অত্যাচার এবং তিনশত বৎসর ধরিয়া খৃস্টান আধিপত্য সত্ত্বেও সনাতন ধর্মের গতিপ্রবাহ রোধ করা যায় নাই। ধর্মান্তরকরণ লইয়া আজ সংসদের ভিতর বাহিরে হল্লা হইতেছে, কিন্তু ধর্মান্তরকরণের উৎস হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত অন্য ধর্মের কোনো ব্যক্তিকে হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরকরণ করা হইয়াছে এমন ইতিহাস মিলিবে কি? বরঞ্চ দেখা যাইতেছে ভয় বা লোভ দেখাইয়া হিন্দুদের অন্যধর্মে ধর্মান্তরিত করা হইয়াছে এবং বর্তমানেও তাহা চলিতেছে। ইসলাম শাসনে এই বাংলায় তরবারির ভয়ে হিন্দুদের মুসলমান ধর্মগ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ নদীয়া, মুর্শিদাবাদে এখনও শাঁখা-সিন্দুর-আলতা পরিহিতা মুসলমান মহিলা মিলিবে। স্বাধীন ভারতে ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, ওড়িশায় বসবাসকারী হাজার হাজার বনবাসী মানুষকে খৃস্টানধর্মে কাহারা দীক্ষিত করিয়াছে? বলপূর্বক ধর্মান্তর রোধ করিবার জন্য আইন রহিয়াছে, কিন্তু লোভ দেখাইয়া ধর্মান্তর গ্রহণ রোধ করিবার কোনো নিদান ভারতীয় দণ্ডবিধিতে নাই। এই সুযোগ লইয়া হাজার হাজার পাদ্রী খৃস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করিতেছে। প্রতিবাদ করিবার ফল হইয়াছে ওড়িশায় স্বামী লক্ষ্মণানন্দ হত্যা ও ধর্মনিরপেক্ষতার নামে হল্লা। উত্তরপ্রদেশ, অসম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে লাভ-জেহাদের নামে মহিলাদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা চলিতেছে। বাধ্য হইয়া আজ সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়াছে মুসলমানের সঙ্গে বিবাহ হইলেই হিন্দু নারীকে ইসলামধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করা যাইবে না। ২০০১ সালে স্বয়ং পোপ ভারতবর্ষে আসিয়া খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করিবার আহ্বান জানাইয়াছিলেন। কিন্তু এই দেশের ধর্মগুরুরা বিদেশে যাইয়া কখনও হিন্দুধর্ম গ্রহণের আহ্বান জানাননি। কারণ জোর করিয়া নয়, হৃদয় দিয়া বিশ্বকে জয় করিতে আগ্রহী ভারতের মানুষ। বিশ্ব হিন্দু পরিষদও এই পরম্পরায় বিশ্বাসী।

হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরকরণ না থাকিলেও পরাবর্তনের কথা বলা হইয়াছে। মুঘল আমলে বহু হিন্দু রাজা বাধ্য হইয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে অবস্থা অনুকূল হইলে বহুজনই আবার হিন্দুধর্মে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। বঙ্গদেশেও এক সময় বহু নারীকে যবনরা লুঠ করিয়া লইয়া যাইত, কিন্তু তাহারা ফিরিয়া আসিলে আধুনিক সমাজ পুনরায় তাহাকে ফিরিয়া আসিতে সাহায্য করিয়াছে। পরাশর স্মৃতি এবং প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রে এই ব্যবস্থা রহিয়াছে। যাহারা ভুল বুঝিয়া একদা হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়াছে অথবা ত্যাগ করিতে বাধ্য করা হইয়াছে তাহারা পুনরায় ঘরে ফিরিলে আপত্তি কোথায়? ইহাই তো হিন্দু সমাজের উদারতা। ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়া এই বিষয়ে আপত্তি থাকিবে কেন? সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত এই জন্যই বলিয়াছেন, যাঁহারা অন্য ধর্মে চলিয়া গিয়াছিলেন, নিজেদের ইচ্ছায় যান নাই। হয় লোভ দেখাইয়া অথবা জোর করিয়া ধর্মান্তরিত করা হইয়াছিল। আজ তাহারা ঘরে ফিরিলে আপত্তি কেন? কেন্দ্রীয় সরকার ধর্মান্তরকরণ বিরোধী আইন পাশ করাইতে ইচ্ছুক, কিন্তু তাহাতেও ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির আপত্তি। এই আপত্তির কারণ কি?

অভিযোগ, এই দেশের ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলিকে তাহাদের ধর্মান্তরকরণ চালাইবার জন্য খৃস্টান লবি ও মুসলমান লবি রাশি রাশি লগ্নি করিয়া থাকে। সেই জন্য গুজরাট, ছত্তিশগড় এবং ওড়িশায় পাদ্রীরা ধর্মান্তরকরণ করিলে এবং পশ্চিমবঙ্গে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, মালদাতে মুসলমানরা ইসলামিকরণ করিলে সকলে নিশ্চুপ থাকেন, কিন্তু বিধর্মীদের হাত হইতে অত্যাচারিতাদের ঘরে ফিরাইবার কথা বলিলেই সকলে সরব হন। এই বজ্জাতি কতদিন চলিবে? বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অশোক সিংহল এইজন্যই বলিয়াছেন, 'ধর্মান্তরকরণ প্রসঙ্গে এখনই আইন করুক কেন্দ্র। তাহা না হইলে হিন্দুরা একতরফা চুপ করিয়া শুধুমাত্র দেখিবে আর হিন্দুদের অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত করিবার খেলা চলিতেই থাকিবে—এই ব্যবস্থা মানিয়া নেওয়া চলিবে না।' বস্তুত, এই দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

সুভাষিত

পঠন্তি চতুরো বেদান্ ধর্মশাস্ত্রণ্যনেকশঃ।
আত্মনং নৈব জানন্তি দর্বী পাকরসং যথা।। (চাণক্য নীতি)

যাঁরা চতুর্বেদ পাঠ করেছেন, নানা ধর্মশাস্ত্র পাঠ করেছেন কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারেননি, তাঁরা হাতার ন্যায় জীবনে কখনো রান্নার স্বাদ পাননি।

কলকাতায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান

সঙ্কল্পে অবিচল থাকার শপথ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে গত ২০ ডিসেম্বর কলকাতায় শহীদ মিনার ময়দানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে 'আমরা সব হিন্দু এক' এই সঙ্কল্পবাক্যে শপথ নিলেন রাজ্যের ষাট হাজারেরও বেশি মানুষ। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক কার্যনির্বাহী সভাপতি ডাঃ প্রবীণ তোগাড়িয়া, রিষড়া প্রেমমন্দিরের অধ্যক্ষ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী, পরিষদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক চম্পতরাই, পরিষদের দক্ষিণবঙ্গ সুবর্ণজয়ন্তী মহোৎসব সমিতির সভাপতি ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী গুরুপদানন্দ, মহানামব্রত আশ্রমের বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী প্রমুখ ওইদিন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীভাগবত তাঁর ভাষণে বলেন, 'হিন্দুধর্ম, হিন্দু সংস্কৃতি, হিন্দু সমাজের সংরক্ষণ করে হিন্দুরাষ্ট্র (জাতি)-র সর্বাঙ্গীণ উন্নতিই আমাদের সঙ্কল্প। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে হিন্দু সমাজের সার্বিক উন্নতি হলে সন্ত্রাসের মতো বিপদ রোধ করা সম্ভব হয়। আজ হিন্দু সমাজ জাগ্রত হওয়ায় স্বজনেরা আশাবাদী হবেন, আর দুর্জনেরা ভয় পাবেনই। কিন্তু আমাদের সঙ্কল্পে অবিচল থাকতে হবে। কাউকে ভয় করবার দরকার নেই। আমরা অনুপ্রবেশকারী নই। আমরা এখানে বাইরে থেকে আসিনি। ভারতবর্ষ আমাদের দেশ। আমাদের হিন্দুরাষ্ট্র। হিন্দু তাই এখান থেকে পালাবে না। হিন্দুকে নিজের সুরক্ষা নিজেই নিশ্চিত করতে হবে। তার উন্নতি তাকেই করতে হবে। যারা হিন্দু সমাজের ক্ষতি করতে চায়, আজ তাদের ভয় পাওয়ার সময় এসেছে। হিন্দুর পথে খুব শীঘ্রই দুনিয়া আসবে।' ভারত আমার দেশ— হিন্দু সমাজের এই সার্বিক স্লোগানের অপব্যাখ্যা একটি বিশেষ মহল থেকে দেবার চেষ্টা হয়। মোহনজী তারও ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন— 'ভারত আমার দেশ। মানে আমি ভারতের মালিক এই মনোবৃত্তি হিন্দুদের নেই। হিন্দুদের কাছে ভারত তার মাতৃভূমি। হিন্দুরা তার সন্তান বলে নিজেদের মনে করে।' ক্ষুদিরামের আত্মবলিদানের উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ দেখলে হবে না। সুখী সুন্দর মানবতার জন্য, পরমবৈভবসম্পন্ন ভারত গড়ে তুলতে আমাদের দেশের স্বার্থ, সমাজের স্বার্থ দেখতে হবে।'

ধর্মান্তরকরণ নিয়ে সভায় প্রত্যেক বক্তাই সরব হন। প্রবীণ তোগাড়িয়া সরাসরি মুলায়ম সিং-কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেন, হিন্দুধর্মে পরাবর্তন যদি অপরাধ-ই হয়ে থাকে তবে সংসদে আইন করে তা বন্ধ করুন। দেশের রাজনীতির কারবারিদের হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বিরোধিতা করে তাঁরা বাঁচতে পারবেন না। তিনি বলেন, 'হিন্দুরা না বাঁচলে কংগ্রেস,

বিরাট হিন্দু সম্মেলন
কয়েক টুকরো ছবি

দেবাশিস আইয়ার ॥ ''দূর মশাই আমাদের হিন্দুদের কিছু হবে না। এত ভালো একটা অনুষ্ঠানে লোক কই? অথচ সিদ্দিকুল্লার সভায় দেখুন কাতারে কাতারে লোক''। মাঠে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ কানে ভেসে এল একটি মাঝবয়সী লোকের আক্ষেপ। স্থান— শহিদ মিনার ময়দান। কাল— ২০ ডিসেম্বর, শনিবারের বারবেলা। ময়দানে তখন মঞ্চ কাঁপিয়ে ভাষণ দিচ্ছেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস। বক্তব্যে সাবলীলভঙ্গিতে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন সরকারের মুসলমান তোষণের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার। শ্রোতারা স্বাভাবিকভাবেই আহ্লাদে আটখানা। প্রায় লক্ষ লোকের করতালিতে টেকা দায়। আর ইনি কিনা বলেন লোক কই? আর কত লোক হলে তিনি খুশি হতেন? না করতে চেয়েও প্রায় মুখ ফসকেই প্রশ্নটা বেরিয়ে গেল। ওঁর চটজলদি জবাব, কেন পাঁচ লক্ষ লোক তো আসতেই পারত। কিন্তু শহীদ মিনারের লোকধারণ ক্ষমতাই তো ৫০ হাজার। তাতে কি, দরকারে কলকাতা একদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যেত। সিদ্দিকুল্লার সভার দিন তো ওরা কলকাতা স্তব্ধ করেই দিয়েছিল। তাহলে আমরা করতে পারি না? ওঁর উত্তরে সাংবাদিক হিসাবে নিরপেক্ষ থেকে বললাম, আপনি কি দীর্ঘদিন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সঙ্গে যুক্ত। প্রায় ঝাঁকিয়ে জবাব, কেন মশাই, হিন্দুর হয়ে কথা বললেই বিশ্ব হিন্দু পরিষদে নাম লেখাতে হয় নাকি? আমি কোনো পরিষদের হয়ে আসিনি, আমি এসেছি 'আমরা সবাই হিন্দু'-র ডাকে। আমি একজন রাজ্য সরকারের কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসার। আজ একটা জায়গায় রেড ছিল। কিন্তু তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো এই সভা। তাই কাজ কামাই করেই চলে এসেছি। কোনো কালেই কোনো পরিষদেই নাম লেখাইনি। বুঝলাম এদিনের জনসভা কার্যতই বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নয়। বরং আমরা সবাই হিন্দুর।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সারা দেশের প্রধান ৫টি শহরে বিশাল হিন্দু সম্মেলনের ডাক দেওয়া হয়েছিল। যার মধ্যে পূর্বক্ষেত্রের সম্মেলনটি আয়োজন করা হয় কলকাতার শহিদ মিনারে। ২০ ডিসেম্বর। সাম্প্রতিক অতীতে কলকাতার বুকে প্রথম হিন্দুত্বের নামে কোনো সম্মেলন। দুপুর ১২টা থেকে ৩টে। কলকাতার প্রধান সমস্ত সংবাদমাধ্যমেই এই দিনটি নিয়ে স্বাভাবিক উন্মাদনা। কারণ রামমন্দিরের সেই উত্তাল আন্দোলন-পর্বের পর এই প্রথম কলকাতা জনসভায় একসঙ্গে অশোক সিংহল, প্রবীণ তোগাড়িয়াকে পাচ্ছে। তার সঙ্গে বাড়তি পাওনা মোহনরাও ভাগবত। ফলে কলকাতা মুখিয়েই ছিল সেই সব মানুষগুলোকে একবার দেখতে যাঁদের পথনির্দেশকে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মান্যতা দেন।

কলকাতা মহানগরের চার প্রান্ত থেকে ৪টি শোভাযাত্রা এদিন একসঙ্গে এসে মিলিত হয় শহিদ মিনারে। এক একটি শোভাযাত্রায় প্রায় হাজার দশেক করে লোক। কিন্তু কোনো প্রান্ত থেকেই কোনো বিশৃঙ্খলতার খবর পাওয়া যাচ্ছে না। ময়দানের গেটে দাঁড়িয়ে থাকা এক পুলিশ অফিসার ওয়াকিটকিতে কিছু নির্দেশ দিচ্ছেন। পাশে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি মিছিলের জন্য খুব যানজট হচ্ছে নাকি? উনি এদিক ওদিক দেখে নিয়ে প্রায় চুপি চুপি স্বরে বললেন, দূর মশাই এ সঙ্ঘ পরিবারের র‍্যালি। বিশৃঙ্খলা হয় নাকি? বুঝলাম সঙ্ঘ পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধার পাশাপাশি চাকরিটাকেও ভালোবাসেন। খামখেয়ালি মুখ্যমন্ত্রী যদি ওঁর সঙ্ঘপরিবারের প্রতি এই ভালোবাসা টের পান তাহলে যে চাকরি যাবে সেই ভয়েই চুপ। নাহলে হয়তো আজকের মিছিলে উনিও নাম লেখাতেন।

সিপিএম, তৃণমূল কেউ বাঁচবে না। তাদের পরিবার পরিজনদেরও কেউ বাঁচাতে পারবে না। যে কারণে বাংলাদেশে কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূলের কোনো অস্তিত্ব নেই।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরামহীন মুসলমান তোষণের উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হজে যাওয়ার ভরতুকি দিচ্ছেন, কিন্তু কাশী যেতে কোনো টাকা দিচ্ছেন না। তিনি মোল্লা-মোয়াজ্জিনদের ভরতুকির টাকা দিচ্ছেন। কিন্তু হিন্দু- পণ্ডিতরা এক পয়সাও পাচ্ছে না। তিনি হিন্দুদের মূল্য শূন্য-য় নামিয়ে দিয়েছেন। হিন্দুদের জিরো থেকে হিরো হতে হবে।' এই লক্ষ্যে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে শপথ বাক্য পাঠ করান তিনি— 'আমি আচরণে হিন্দু হব। আমি জাগ্রত হিন্দু হব। আমি সক্রিয় হিন্দু হব। এর জন্য দরকার সামাজিক সমতা, নিজেদের সুরক্ষিত ও সংগঠিত করা। আর এটা করলেই আমরা সুরক্ষা, সম্মান, সমৃদ্ধি ও স্বাভিমান অর্জন করতে পারব।'

আনুষ্ঠানিক শপথ বাক্য— 'আমরা সব হিন্দু এক' অবশ্য পাঠ করান দেবানন্দ ব্রহ্মচারী। তাঁর বক্তব্য : 'হাজার বছরের পরাধীনতা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ বিদ্যাচর্চায় বিশ্বের মধ্যে অগ্রগণ্য। আজ জাগরণের সময় এসেছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পঞ্চাশ বছর পূর্তি সেই মাহেন্দ্রক্ষণ।' তিনি জানান, পঞ্চাশ বছরে পরিষদের উদ্‌ঘোষ গো-পালন, গো- সংরক্ষণ, গো-বৃদ্ধি, গো-জাতির মুখে খাদ্য জুটিয়ে গো-বংশকে রক্ষা করতে হবে এবং হিন্দু সমাজ থেকে সমস্ত ধরনের অস্পৃশ্যতা দূর করতে উদ্যোগী হতে হবে।' গৌড় বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অচিন্ত্য বিশ্বাস বলেন : 'হিন্দুত্বই মানবত্ব, হিন্দুত্বই ভারতীয়ত্ব। এছাড়াও সভায় বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী ও স্বামী গুরুপদানন্দ বক্তব্য রাখেন। পরিষদের মুখপত্র বিশ্ব হিন্দুবার্তার বিশেষ সংখ্যার প্রকাশ করেন মোহনরাও ভাগবতজী। অনুষ্ঠানের শুরুতে সংস্কার ভারতীর শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

মঞ্চে তখন তোগাড়িয়াজীর রক্ত গরম করা ভাষণ। শহিদ মিনারের তলায় লাগানো জায়ান্ট স্ক্রিনের সামনে কয়েকজন জিনস্ পরিহিতা কলেজপড়ুয়া ছাত্রী। কি ব্যাপার ক্লাস বাঙ্ক করে নাকি? না না, আজ কলেজ ছুটি। তাহলে নিউ-ইয়ার্সের মার্কেট না করে এখানে? উত্তরে সমস্বরে থাম্বস্ আপ করে কলেজ পড়ুয়াদের স্বাভাবিক ঢঙে চিয়ার্স, because we are hindu. তাহলে শুধু এর জন্য ছুটে আসা? হ্যাঁ, আর কলকাতা এসেছি বলে বড়দিনের কথা মাথায় রেখে একটা নাহুমের ফ্রুট-কেক কিনে বাড়ি ফিরব। বুঝলাম, বড়দিনে কেক খাওয়া জিনস্ পরা এদিন সোয়া লাখের জনসমাবেশ।

মঞ্চে দেবানন্দ মহারাজ বক্তব্য রাখছেন। আর ময়দানের শেষ প্রান্তে জটলা করে কিছু লোকের গল্পবাজি। কি দাদা, সঙ্ঘপরিবারের হিন্দুদের এই ডিসিপ্লিন? ক্ষুব্ধ জবাব, সাংবাদিক না? এত ভালো সভায় ভালো কিছু চোখে পড়ল না, জটলাটাই চোখে পড়ল? শুনে রাখুন আমরা ব্রাহ্মণ হিন্দু নয়, আমরা ক্ষত্রিয় হিন্দু। আমাদের শাস্ত্রবচনের থেকে শস্ত্র বেশি প্রিয়। ওই বক্তব্য না শুনেও আমরা হিন্দুত্বের নামে এক নিমেষে জীবন দিতে পারব। আলাদা করে ওই বক্তব্য শুনে উদ্বুদ্ধ একটু আগে একটা অ্যাপ্রন পড়ে ময়দানের বিভিন্ন কোণে জমা হওয়া আবর্জনা, ফেলে দেওয়া জলের প্যাকেট, খাবারের প্যাকেট তুলে একটা বস্তায় ভরছিল। দেখে তো মনে হচ্ছিল সাফাই কর্মী। আর এ এখন স্মার্ট নিয়ে কি করছে? কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে জানা গেল, ইনি একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়র। নামী কম্পানিতে দামি মাহিনায় কর্মরত। আজ এখানে ভলান্টারি সার্ভিস দিতে এসেছেন। নিজের ইচ্ছায় স্বচ্ছতা বিভাগের কাজ নিয়েছেন। কিন্তু ভাগবতজীর ভাষণের বিন্দুগুলো সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ছড়ানো হবে না তা কি হয়? তাই চটপট

শহিদ মিনারের অভিমুখে শোভাযাত্রা। (প্রচ্ছদসহ শহিদ মিনারের অনুষ্ঠানের ছবিগুলি তুলেছেন বাসুদেব পাল)

মর্ডান জেনারেশনও হিন্দুত্বের নামে গর্বিত হয়। আর তাই মিডিয়া যতই বলুক ২০১৪-এর ভোট শুধু উন্নয়নের নামে হয়েছে। আসলে এটি ছিল হিন্দুত্বের নামে উন্নয়নের ভোট। তাই ভোটের পর থেকেই সমাজের বাতাসে কান পাতলে প্রায় সব মহল থেকেই হিন্দুত্বের নামে গর্বিত হওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে। তাইতো মুসলমান পরস্ত রাজ্য সরকারের হাজারো রক্তচক্ষু এড়িয়েও হতে হবে না। বোঝা গেল, বিশৃঙ্খলতার মধ্যেও হিন্দুত্বের শৃঙ্খল কেমন অটুট।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে ভাগবতজীর ভাষণ। পরাবর্তন নিয়ে খোলাখুলি বলছেন। হঠাৎ করে একটি ছেলে ময়লা মাখা হাতটা পকেট থেকে রুমাল বের করে মুছল। আর তার পরই প্যান্টের আর এক পকেট থেকে দামি স্মার্ট ফোন বার করে টপাটপ কি সব লিখতে শুরু করল। আরে, এই ছেলেটা তো ফেসবুকে, টুইটারে, হোয়াটস্ অ্যাপে ভাষণের মূলবিন্দুগুলো আপলোড করে দিচ্ছেন। সত্যি, হিন্দুত্বের ত্রিবেণী সঙ্গমই বটে। যেখানে ব্রাহ্মণ শূদ্রের বিভেদ ভুলে আজ সবাই হিন্দুত্বের নামে। মুখে একটাই স্লোগান, আমরা সবাই হিন্দু। মনে একটাই ভরসা, ৮০০ বছর পর দেশে হিন্দুদের সরকার। হিন্দু সম্মেলন এখন হবে না তো কখন হবে? ■

আবেগ আছে, কিন্তু অচলায়তন সরাবে কে?

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি ॥ ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশে আবেগটা বেশি, বিজয়ের মাস। পুরো মাস জুড়ে নানা অনুষ্ঠান, উৎসব। ন'মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধশেষে ১৬ ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৪টা ৩১ মিনিটে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে (তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান) বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমান্ডের অধিনায়ক লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন ৯০ হাজার সেনা নিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অধিনায়ক লে. জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজি। প্রতি বছর বিজয় দিবসে রাজধানীর বিভিন্ন সড়ক দ্বীপে এই আত্মসমর্পণের ঐতিহাসিক ছবি টাঙানো হয়। ছবিটি দেখা যায় সরকারি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অফিসেও। সংবাদপত্র প্রতি বছর আত্মসমর্পণের ছবিসহ বিজয় দিবসের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম (মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডারদের নিয়ে গঠিত সংগঠন) সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রতি বছর বিজয় দিবসে স্বাধীনতা স্কোয়ার চত্বরে এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি উদযাপন করে সেই আত্মসমর্পণের দৃশ্যটি মঞ্চায়নের মাধ্যমে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এবার আরও বাড়তি উদ্যোগ দেখা গেল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামি লিগের অঙ্গ সংগঠন স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের বিজয় দিবস উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধের চিত্র প্রদর্শনীতে, যেখানে এই ছবিটিকেই প্রধান করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হচ্ছে, গত ৪৩ বছর ধরে বিভিন্ন ফোরাম বা সংগঠন থেকে দাবি জানানো সত্ত্বেও জেনারেল অরোরার নামে কোনো সড়কের নামকরণ করা হয়নি। ইন্দিরা গান্ধী, ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী, যাঁকে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের মা বলে অভিহিত করা হয়, তাঁর নামেও কোনো সড়কের নাম নেই ওইভাবে দাবি ওঠার পরও।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী প্রায় ১৭ হাজার ভারতীয় জওয়ানের কোনো স্মৃতিস্মারক নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশসহ মিত্রবাহিনীর নিহতদের স্মৃতিস্মারক আছে। নেই ভারতীয় জওয়ানদের, যাঁদের নাম বাংলাদেশের ন'মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়ে যুক্ত হয়ে গেছে। কেন নেই এ জবাব রাজনীতিকদের কাছে নেই, নেই মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামি লিগ সরকারের কাছেও। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের উল্টোদিকে কয়েক বছর আগে মুক্তিযোদ্ধা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে একটি অতি ছোট স্মৃতিফলক স্থাপিত হয়েছিল, যেখানে উৎকীর্ণ আছে 'শহীদ ভারতীয় জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি'। প্রতি বছর ৬ ডিসেম্বর একাত্তরে ভারতের স্বীকৃতির দিনটিকে স্মরণ করে এখানে কয়েকটি সংগঠন ফুল দেয়। শ্রদ্ধার্ঘ্য ওটুকুই, না কোনো সরকারি আয়োজন নয়। ওইদিন সাফসুতোর করা হয়। বাকি ৩৬৪ দিন অনাদরে অশ্রদ্ধায় পড়ে থাকে স্মৃতিফলকটি। কাক ও উদ্যানে উড়ে বেড়ানো নানা পাখির মল ও রাস্তার দোকানপাটের ময়লা আবর্জনা নিয়ে কোনো রকমে অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে এই স্মৃতিফলক। শহীদ ভারতীয় জওয়ানদের নামে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের আবেগ আছে, কিন্তু অচলায়তন সরাবে কে?

এবার আরও এক বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটেছে বিজয় দিবসের আয়োজনে। মহান একুশের গানের রচয়িতা, লন্ডনপ্রবাসী সাংবাদিক আবদুল গফ্ফর চৌধুরী বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনাসভায় বলেছেন, 'বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে দু'বার স্বাধীন করেছেন। একবার পাকিস্তানি সেনাবাহিনী থেকে। আরেকবার ভারতের সেনাবাহিনীকে বাংলাদেশ থেকে চলে যেতে বলে। এটা আরেক স্বাধীনতার সমান।' অর্থাৎ ভারতীয় মিত্র বাহিনীকেও তিনি কার্যত হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর সমান কাতারে দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং দখলদার বাহিনীর তকমা লাগিয়ে দিলেন গায়ে। মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানো ও প্রাণ বিসর্জনের জন্য ভারতীয় মিত্রবাহিনী এভাবেই 'সম্মানিত' হলো। আর মিত্রবাহিনী এই অভিধায় ভূষিত হলো এমন একজন শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবীর কাছ থেকে যিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একান্ত আপনজন। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানেরও ঘনিষ্ঠ ছিলেন। জামায়াতে ইসলামি ও বিভিন্ন ইসলামি দল সরাসরি, বিএনপি পরোক্ষভাবে মিত্রবাহিনী সম্পর্কে এ মনোভাব প্রকাশ করেছে বিভিন্ন সময়ে। উগ্র চীনপন্থী বামদলগুলো একাত্তরে বিজয়ের পরপরই ভারতীয় বাহিনী হটাও জিগির তুলেছিল। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামি শিবির থেকে শীর্ষ পর্যায়ের কোনো ঘনিষ্ঠজনের কাছ থেকে এই প্রথম এ মনোভাব ব্যক্ত হলো। ■

সবার প্রিয়
বিল্লদা
চানাচুর
'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

সাংবাদিকদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে খবর প্রকাশ বন্ধ করা যায় না

গূঢ়পুরুষের কলম

এই রাজ্যে এখন অঘোষিত জরুরি অবস্থা চলছে। সবচেয়ে কঠিন অবস্থার মধ্যে চলতে হচ্ছে সাংবাদিকদের। সরকারি প্রেসকার্ড থাকা সত্ত্বেও নবান্নে পুলিশের হাতে প্রতিদিন হেনস্থা হতে হচ্ছে সাংবাদিকদের। সারদা কেলেঙ্কারিতে তৃণমূল নেত্রী এবং তাঁর বশংবদ মন্ত্রী ও সাংসদরা জড়িয়ে পড়ার পর দিদির সব রাগ এখন সাংবাদিকদের উপর। দিদি হুকুম জারি করেছেন নবান্নে কোনো মন্ত্রী বা সরকারি কর্মী তাঁর অনুমতি ছাড়া সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন না। পুলিশকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে নবান্নের প্রেস রুমের বাইরে কোনো সাংবাদিককে ঘোরাফেরা করতে দেখলে গ্রেপ্তার করতে হবে। জরুরি অবস্থার পর সাংবাদিকদের উপর এমন বিধিনিষেধ জুলুমবাজি আর হয়নি। ১৯৯৩ সালে মহাকরণের দোতলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর সঙ্গীদের ধর্না ভাঙতে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পুলিশ ডাকেন এবং লাঠি চার্জ করা হয়। এই ঘটনার পরদিন দোতলায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের গড়া সুদৃশ্য প্রেস কর্নারটি তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী বুদ্ধদেববাবুর নির্দেশে ভেঙে দেওয়া হয়। মন্ত্রীর বক্তব্য ছিল কিছু সাংবাদিকের প্ররোচনায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্না শুরু করেছিলেন। সেদিন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে বলতে পারি যে চরিত্রগতভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। দু'জনেই নিজেদের সবজান্তা বলে মনে করেন। দু'জনের হামবড়া অহংবোধ আকাশছোঁয়া। দু'জনেই সমান নির্বোধ। সাংবাদিকদের গতিবিধিতে লাগাম পরাতে গিয়ে দু'জনেই ব্যর্থ হয়েছেন। এর কারণ সাংবাদিকরা কীভাবে খবর সংগ্রহ করেন সে ব্যাপারে তাঁরা নিতান্তই অনভিজ্ঞ শিশু। সব পেশাতেই কিছু স্তাবক তোষামোদকারী ব্যক্তি থাকেন। সাংবাদিকতা পেশাতেও আছে। এই স্তাবকেরা বুদ্ধদেববাবুকেও ভুল পথে পরিচালিত করেছিল। এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও করছে। বুদ্ধদেববাবু ডুবেছেন। মমতাও ডুবতে চলেছেন। যদি সত্যি তাঁরা সবজান্তা বুদ্ধিমান হতেন তবে বুঝতে পারতেন সরকারি উচ্ছিষ্টভোজী স্তাবক সাংবাদিকরা বিশ্বাসযোগ্য হয় না।

সাংবাদিকদের গতিবিধিতে নজরদারি চালিয়ে খবর করা বন্ধ করা যায় না। এটা একেবারেই ভুল ধারণা যে মন্ত্রী আমলারাই খবরের একমাত্র সূত্র। আমার সাংবাদিক জীবনে মাত্র একবার কোনো মন্ত্রীকে দুর্নীতি ফাঁস করতে দেখেছিলাম। তিনি প্রয়াত যতীন চক্রবর্তী। বেঙ্গল ল্যাম্প দুর্নীতিতে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে জড়িয়েছিলেন। তার চরম মূল্যও তাঁকে দিতে হয়েছিল। দীর্ঘ বহু বছর ধরে চেষ্টা চালিয়ে সাংবাদিকরা খবরের সোর্স তৈরি করেন। সেই সোর্স মন্ত্রী বা আই এ এস সচিবরা নয়। প্রশাসনের ওপরতলার লোকেরা সেই ইংরেজ আমল থেকেই দুর্নীতি ধামাচাপা দিতে যতটা দক্ষ ততটা ফাইল চালাচালিতে নয়। তাই নবান্নে সাংবাদিকদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে খবর পাওয়া বা লেখা বন্ধ করা যায় না। যাচ্ছেও না। প্রতিদিন খবরের কাগজের প্রথম পাতায় তৃণমূলের নেতা নেত্রীদের কেচ্ছা কেলেঙ্কারির খবর পড়তে হয়।

প্রাক্তন বিচারপতি সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গে জরুরি অবস্থার সময়ের মতো অরাজকতা চলছে। রাজ্যে যা চলছে, তা সুস্থ মানুষ মানতে পারে না।' সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এবং রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অশোক গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, 'স্বামী বিবেকানন্দ এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর পাশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি প্রতিটি সরকারি অফিসে রাখার নির্দেশিকা মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে জারি করা হয়েছে। এই রাজ্যের ঐতিহ্যের সঙ্গে এমন সরকারি নির্দেশিকা বেমানান।' রাজ্যের বিরোধী দলের নেতারা অভিযোগ করছেন যে 'মুখ্যমন্ত্রী বেতন নেন না। তাহলে ওঁর চলে কী করে। তাঁর শাড়ি, চটি, গাড়ির তেল কে কিনে দিচ্ছে।' সত্যিই বিনা উপার্জনে এমন মাগ্গিগণ্ডার বাজারে রানীর হালে দিন কাটানোর গোপন রহস্যটি দিদি যদি ফাঁস করেন তবে বাংলার প্রতারিত মানুষজন বেঁচে যেত। দিদির স্তাবকরা কী বলছেন জানতে ইচ্ছা করে। তৃণমূলের জমানায় এই রাজ্যে লোকায়ুক্ত নেই। কেন? কারণ, মুখ্যমন্ত্রী প্রায়ই বলেন, 'আই অ্যাম দ্য গভর্নমেন্ট'। মুখ্যমন্ত্রী ভারতের সংবিধান, সুপ্রিম কোর্টের রায় কিছুই মানেন না। সারদা কেলেঙ্কারির পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ সিবিআইকে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। তখন কেন্দ্রে ক্ষমতায় ছিল না বিজেপি। তবু মুখ্যমন্ত্রী নাগাড়ে বলে চলেছেন, বিজেপি-র নির্দেশে সিবিআই তাঁর দলের মন্ত্রী সাংসদদের জেলে পুরছে। আসলে মিথ্যাচার যে ব্যক্তির চরিত্র তাকে শোধরানো যায় না। তৃণমূলের সদস্যদের সদস্যভুক্তির চাঁদা দিতে হয় না। দিদিমণি ছবি বিক্রি করে দলের খরচ চালান। সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেন ১ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকায় একবার একটা ছবি কিনে ছিলেন। তারপর দিদির আঁকা ছবি একটা টাকাও খরচ করে কেউ কেনেনি। সারদাকাণ্ডের জেরে রাজ্যের সব চিটফান্ডগুলি যেভাবে পালাচ্ছে তাতে ভবিষ্যতেও দিদির আঁকা ছবি বিক্রি হবে বলে মনে হয় না। তবে চিন্তা নেই। দিদি ম্যাজিক জানেন। বিনা উপার্জনে যদি নিজে দিব্য থাকেন তাহলে তিনি গুপ্তধনও পেতে পারেন। তৃণমূলে ভাঁড়ারে বুদ্ধি কাণ্ডজ্ঞানের অভাব থাকতে পারে। কিন্তু অর্থের অভাব নেই। ■

চোরের দিদির বড় গলা !

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

এই চিঠির শিরোনাম দেখে একদম হাসবেন না। সেটা কিন্তু মারাত্মক অপরাধ। এ জন্য আপনাকে জেলেও যেতে হতে পারে। তখন আবার খবরের কাগজে হেডলাইন হবে, 'স্বস্তিকার পাঠক- পাঠিকারা হাসতে হাসতে জেলে গেলেন'। আমার দিদি বেজায় চটে যান ওসভ অভব্য হাসি দেখে। কার্টুন ফার্টুন উনি একদম পছন্দ করেন না। উনি নিজেকে কী মনে করেন সেটা বোঝা যায় সাম্প্রতিক ওই ফেস্টুনে। যেখানে নেতাজী আর স্বামীজীর মাঝখানে বহাল তবিয়তে আমাদের দিদিজী হাজির।

যাই হোক, আমার মতো দিদিভক্ত যে ওই শিরোনাম লিখেছে সেটাও অবশ্য ভাববার বিষয়। তবে কি আমিও দিদির অন্য ভাইদের মতো তাঁর থেকে সরে যাচ্ছি। একটু একটু করে উলটো মত পোষণ করছি। না, তেমনটা মোটেও নয়। দিদির রাজনৈতিক ভাইয়েরা আজকাল মদন-প্রিয়তা দেখে চটে গেলেও আমি ভাইটি এখন দিদির অনুগত সৈনিক। আমি আবার সৈনিক! ঢাল নেই, তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার।

এই যে শিরোনামটা সেটা আমার বক্তব্য মোটেও নয়। দিদিকে খোঁচা দেওয়ার ইচ্ছা বা সাহস কোনওটাই আমার নেই। কিন্তু লোকজন এটা বলতে শুরু করেছে। প্রকাশ্যেই বলছে। এই রাজ্যটার হলোটা কি! ট্রেনে বাসে এসব আলোচনা যে হচ্ছে তা দেখে ভাবছি সাহস কি বাড়ছে নাকি মানুষের! দিদি যদি একটা আরাবুল লেলিয়ে দেয় তখন সবাই বুঝতে পারবে।

আসলে বাঙালি এখনও দিদি-মাহাত্ম্যটাই বুঝতে পারল না। একটা ভাই চুরি করে ধরা পড়লেই কি তাঁকে ত্যাজ্য করে দিতে হবে নাকি! আর সেটা করা মানে কাজের বেলা কাজি, কাজ ফুরোলেই পাজি। আর আমার দিদি মোটেই তেমন পাজি নন। আর একটা ভাইতো নয়, দিদির একের পর এক ভাই জেলে যাচ্ছে। কুণাল, টুম্পাই, মদন। শোনা যাচ্ছে সহোদর ভাইয়েদের কেউ কেউও তদন্তকারীদের শীঘ্রই তলব পাবেন। আজ মদনকে ছেড়ে দিলে পরে মায়ের পেটের ভাইদেরও কি ছেড়ে দিতে মানে ছেটে ফেলতে হবে নাকি!

তবে ভাই অনুসারে দিদির ব্যবহারেও কেমন যেন বৈমাত্রেয়সুলভ আচরণ দেখা যাচ্ছে। দিদি বলছেন, মদন তদন্তে সহযোগিতা করছিল তবু তাঁকে কেন গ্রেপ্তার করা হলো? পালটা প্রশ্ন উঠছে তাঁর কুণাল ভাইও তো সিট ডাকলে হাজিরা দিয়ে তদন্তে সাহায্য করেছিলেন। তবে তাঁকে কেন গ্রেপ্তার করে দিদির পুলিশ? দিদি বলছেন, মদন মিত্র একজন বিধায়ক। কিন্তু তাঁকে গ্রেপ্তার করার আগে কেন বিধানসভার স্পিকারকে জানানো হলো না? প্রশ্ন উঠছে, সিপিএম বিধায়ক সুশান্ত ঘোষকে গ্রেপ্তারের সময় কি তিনি স্পিকারের অনুমতি নিয়েছিলেন? সাংসদ কুণাল ঘোষকে গ্রেপ্তারের আগে জানিয়েছিলেন রাজ্যসভার স্পিকারকে? তাছাড়া সাংসদ সৃঞ্জয় বসুকে গ্রেপ্তারের পর যেভাবে নিয়ম মেনে রাজ্যসভার স্পিকারকে জানিয়েছিল সিবিআই মদন মিত্রের ক্ষেত্রেও সেই একই নিয়ম মেনেছে তারা। তবে সৃঞ্জয়ের বেলা আন্দোলনে না নেমে মদন পাকড়াও হতেই কেন এত শোরগোল?

এসব প্রশ্ন যাঁরা তুলছেন তাঁদের কতগুলো কথা মনে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে প্রেমে আর যুদ্ধে কোনো নিয়ম থাকে না। আর আমার দিদি সব কিছুকেই যুদ্ধ বলে মনে করেন। সুশান্ত ঘোষ থেকে কুণাল ঘোষ গ্রেপ্তার সবটাই ছিল যুদ্ধ। আবার সারদা তদন্তে সিবিআইয়ের বিরোধিতা করা কিংবা এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে জড়িয়ে ফেলাটাও তাঁর রণকৌশল। তাই এই তদন্ত সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে জানার পরও, এর সঙ্গে বিজেপি-র কোনো রাজনৈতিক যোগ নেই জানার পরও তিনি সেসব অভিযোগ তুলে চলেছেন। আগেই বলেছি, রণে আর প্রেমে কোনো নিয়ম নেই। এটা যে মদনের প্রতি প্রেম আর সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে রণ।

ভুলে যাবেন না পাঠক-পাঠিকা যে আমার দিদির একটা বিদেশি আইন-পাশের ডিগ্রি আছে। সুতরাং তাঁর আইন জ্ঞান নিয়ে কোনোরকম হেলাফেলা করবেন না প্লিজ। তিনি সব জানেন। তবু বিষয়টা যেহেতু যুদ্ধ তাই তিনি ভুলভাল কিছু প্রশ্ন তুলছেন। তিনি বলেছেন, বেছে বেছে মদন মিত্রকে শুক্রবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে যাতে শনি ও রবিবার ছুটির দিনে জামিনের আবেদন জানানো না যায়। কিন্তু প্রকৃত তথ্য হচ্ছে গ্রেপ্তারের পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যে-কোনো বারেই আদালতে পেশ করতে হয়। সেজন্য ছুটির মধ্যেও বিশেষ আদালত বসে। তিনি বলেছেন, বিচার হচ্ছে সিবিআইয়ের তৈরি করা নিজস্ব আদালতে। কিন্তু তা আদৌ নয়, বিচার চলছে আলিপুর আদালতে। আর সিপিআই আদালতে বিচার হলেও তার বিচারপতি নিয়োগ সিবিআই করতে পারে না। নিরপেক্ষতাকে গুরুত্ব দিয়ে সাধারণ নিয়মেই সেখানে বিচারক নিয়োগ করা হয়।

এসব দিদি সবই জানেন। তবু এসব বলেন। কারণ, তাতে তাঁর দলের একেবারে নিচুতলার কর্মীদের সিবিআই, কেন্দ্র এবং বিজেপি-র বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলা যায়। আর তাতে দিদি অনেকটাই সফল। সুতরাং, চোরের দিদির বড় গলা শুনে একদন হ্যা হ্যা করে হাসবেন না বলে রাখলাম।

— **সুন্দর মৌলিক**

ইসলামি সন্ত্রাস : পশ্চিমবাংলায় বিপন্ন হিন্দুত্ব

দেবব্রত ঘোষ

অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াড (এ.টি.এস) ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশান এজেন্সী (এন.আই.এ), ন্যাশনাল সিকিউরিটি গ্রুপ (এন.এস.জি) ফাইনান্সিয়াল ইন্টিলিজেন্স ইউনিট (এফ.আই.ইউ) এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট (ই.ডি) এবং সিবিআই যৌথ তদন্ত চালাচ্ছে বর্ধমান বিস্ফোরণ কাণ্ডের। এই বিস্ফোরণের বীজ ছড়িয়ে ছিল অনেক আগে থেকেই সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ, মালদহ, নদিয়া এবং দিনাজপুর জেলার প্রান্তিক এলাকাগুলোতে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আচমকা মন্তব্য করে বসলেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং) এই বিস্ফোরণের জন্য দায়ী। এই ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের সহায়ক হতে পারে, কিন্তু গোটা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা যেখানে জড়িত, মানবতার শত্রু ইসলামিক জেহাদিরা যেখানে কারাগারে রয়েছে (যেটা সিবি আইয়ের কৃতিত্বে হয়েছে) সেখানে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের মুখনিসৃত এই ধরনের মন্তব্য শুধু যে বিভেদকামী সন্ত্রাসবাদীদের হাতকেই শক্ত করে তা নয়, সমগ্র ভারতীয় সমাজ, জাতিসত্তা ও রাষ্ট্রকে বিশ্বের কাছে হেয় এবং হাস্যাস্পদ করে।

ইসলামি সন্ত্রাস ও নীরব রাজ্য প্রশাসন : পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন প্রান্ত এখন হরকত-উল-জিহাদি-ইসলামি (হুজা), হিজবুল মুজাহিদিন, লস্কর-ই-তৈবা, জামাত-উল-মুজাহিদিন (জুম), ইসলামিক স্টেট (আই এস), আনসার-উল- তউহিদ-সহ বিভিন্ন মুসলমান জঙ্গিগোষ্ঠীর অবাধ বিচরণভূমি এবং নিরাপদতম আশ্রয়স্থল। সাউথ চব্বিশ পরগনার জয়নগর গ্রামের বাসিন্দা মহম্মদ জালালুদ্দিন এক নৃশংস ইসলামি জঙ্গি যে বাংলাদেশের মৌলবাদী সংস্থাগুলো থেকে আর ডি এক্স-সহ বিভিন্ন মারাত্মক বিস্ফোরক পদার্থ সংগ্রহ করে পশ্চিমবাংলা হয়ে ভারতের বিভিন্ন শহরে পৌঁছে দিত। কলকাতার জাকারিয়া স্ট্রিটের ব্যবসায়ী শেখ সামির, মহম্মদ জালালুদ্দিনের সঙ্গে একযোগে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম চালাতো। কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী ইলিয়াস কাশ্মীরি, ইকবাল ভাট, আবদুল কুরেশি আর আব্দুল মজিদ সফি খাস কলকাতার ছেলে আমির রেজার (যে বিভিন্ন ছদ্মনাম ব্যবহার করতো যেমন মুক্তাকি, রিজওয়ান, পারভেজ ইত্যাদি) সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল এবং এই পঞ্চমূর্তির সঙ্গে কর্ণাটকের কট্টর জঙ্গিনেতা আবদুল কাদির সুলতান আরমারের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। বর্ধমান বিস্ফোরণের সঙ্গে এই ৬ জন কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী জঙ্গির সরাসরি যোগ ছিল এবং আমাদের রাজ্যের মুসলমান তোষণকারী সরকার জেনেশুনে ইসলামি মৌলবাদের বাড়বাড়ন্ত দেখেও চুপচাপ ছিল। কারণ একটাই— মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক।

মুর্শিদাবাদের লালগোলা, ভগবানগোলা, বেলডাঙ্গা, নদিয়ার করিমপুর, উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগর, বসিরহাট, দিনাজপুরের হিলির মতো বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকাগুলো দীর্ঘকাল ধরেই মুসলমান জঙ্গিগোষ্ঠীর চারণক্ষেত্র এবং কেন্দ্রীয় সরকার বারবার সতর্ক করে দিলেও পশ্চিমবাংলার ছদ্মনিরপেক্ষ তৃণমূল সরকার কোনো প্রশাসনিক পদক্ষেপ বা অনুপ্রবেশ রুখতে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করেনি। বাংলাদেশের জঙ্গি জাহিদুল ইসলাম ও মহম্মদ সালাউদ্দিন বোমা ও বিভিন্ন বিস্ফোরক তৈরিতে বিশেষজ্ঞ যাদের সঙ্গে নদিয়া, মালদহ, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন জঙ্গি মডিউলগুলোর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। সিমির সক্রিয় সদস্য হারুণ রশিদ জুম-জামাত-সিমির মধ্যে কো-অর্ডিনেটারের কাজ করতো আর কলকাতা থেকে সিবিআই কর্তৃক গ্রেপ্তার হওয়া জাহিদ হুসেন এবং নদিয়া সিবিআই কর্তৃক গ্রেপ্তার হওয়া আনোয়ার হোসেন মল্লিকের সঙ্গে ইয়াসিন ভাটকলের যোগাযোগের তথ্য সিবিআই পেয়েছে।

বাংলাদেশের জামাতের নেতা সফিকুরকে অসম পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। এই সফিকুর আবার শিমুলিয়ার ইউসুফের ঘনিষ্ঠ, যে ইউসুফ মাদ্রাসার অভ্যন্তরে উগ্রপন্থী ও জেহাদি বই ছাপানো, জেহাদি ট্রেনিং দেওয়া এবং বিস্ফোরক নির্মাণে যুক্ত ছিল। আমাদের রাজ্য পুলিশ কিছুই জানতো না বা জানলেও চুপ করেই ছিল। বর্ধমানের ভাতার গ্রামের ট্রাক ড্রাইভার আসাদুল্লা শেখ ইউসুফ এবং বোরহানের সঙ্গে যুগ্মভাবে জামাত-উল-মুজাহিদিনের সঙ্গে মিলিত হয়ে পশ্চিমবাংলায় সন্ত্রাসবাদী কাজ চালিয়ে গেছে। নদিয়া জেলার গামখালি গ্রামের জহিরুল আলি শেখ এবং তার স্ত্রী খানসা বিবি (মাদ্রাসা ছাত্রী) সরাসরি জেহাদমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাদের ঘরে বিভিন্ন জেহাদি পুস্তিকা, লিফলেট, ধর্মান্ধ উসকানিমূলক বই পাওয়া গেছে। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ অবশ্য কিছুই করতে পারেনি (বা করতে চায়নি)। যা কিছু ধরপাকড় সিবিআই-ই করেছে। আর সেকারণেই আমাদের রাজ্যের ইসলামপ্রেমী প্রশাসনিক প্রধান ও তার দলের নেতানেত্রীরা সংসদে সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন।

সুন্নতুল জামাত, মাদ্রাসা ছাত্র ইউনিয়ন, আসিকান রসুল কমিটি, মিল্লি ইত্তেহাদ পরিষদ, অল ইন্ডিয়া মিল্লি কাউন্সিল, মুসলিম মজলিসে মুসাওয়াতে, আমিনিয়া জমিয়তে মুক্তাকিন, বাংলা সংখ্যালঘু কাউন্সিল ছাড়াও অনেক মুসলমান সংগঠন কলকাতা শহরে এবং বর্ধমান শহরে প্রকাশ্য জনসমাবেশ

করে যেখানে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত ধর্মান্ধ মুসলমানরাই অংশগ্রহণ করেছিল এবং সেই জনসভাগুলো হয়েছিল অনেক ইমামদের প্রকাশ্য সমর্থন ও উপস্থিতিতে। আর সেই সব সমাবেশের পেছনে অন্যতম কারিগর ছিলেন তৃণমূলের সাংসদ আহমেদ হাসান ইমরান (নিষদ্ধ সংগঠন সিমির সক্রিয় সদস্য) যিনি চরম সাম্প্রদায়িক পত্রিকা কলামের সম্পাদক শুধু তাই নয় এই ইমরানের প্রত্যক্ষ মদত ও প্ররোচনায় উগ্রপন্থী মুসলমানরা ক্যানিং-এর হিন্দু গ্রামে অসংখ্য হিন্দুদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছিল এই তৃণমূল জমানাতেই। একটা প্রতিবাদও করেননি তৃণমূল সরকারের প্রশাসনিক প্রধান বা অন্য কোনো তৃণমূল নেতা। প্রতিবাদ করেনি সিপিএম বা কংগ্রেস নেতারাও।

ইসলামি আগ্রাসন ও বিপন্ন হিন্দুত্ব : ১৯৫১ সালে বাংলাদেশে (তখনকার পূর্ব পাকিস্তান) হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ২২ শতাংশ এবং ২০১৪ সালে হিন্দু জনসংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ৮ শতাংশ মাত্র। আর আমাদের পশ্চিমবাংলায় ১৯৫১ সালে মুসলমান জনসংখ্যা ছিল ১৯.৯ শতাংশ যা এখান হয়ে দাঁড়িয়েছে ৩২ শতাংশের কাছাকাছি। এই পরিসংখ্যান প্রমাণ করে মুসলমান জনসংখ্যা ৩০০ শতাংশ বেড়েছে যার অবধারিত ফল হিসেবে মুসলমান ভোটারের সংখ্যা এবং মুসলমান অধ্যুষিত নির্বাচনী এলাকাও বৃদ্ধি পেয়েছে। মুর্শিদাবাদে তিনটে, নদিয়া এবং উত্তর দিনাজপুরে দুটো করে, মালদহ এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে ১টা করে মুসলমান আসন বেড়েছে আর বিপরীত দিক থেকে হিন্দুপ্রধান এলাকায় বিধানসভা আসন সংখ্যা কমেছে অনেকটাই, যেমন পশ্চিম মেদিনীপুর আর পুরুলিয়ায় দুটো করে, বীরভূম, হুগলি আর বর্ধমান জেলায় হিন্দুপ্রধান এলাকায় বিধানসভা আসন সংখ্যা কমেছে একটা করে। বাংলাদেশ থেকে অসহায় হিন্দুদের পশ্চিমবাংলায় শরণার্থী হিসেবে আগমনের জন্য, হিন্দুদের বলপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণের জন্য বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা কমছে আর এ রাজ্যে সিপিএম জমানায় এবং বর্তমান তৃণমূল জমানায় মুসলমান অনুপ্রবেশ বেড়ে যাওয়ায় পশ্চিমবাংলার জনসংখ্যায় ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়েছে এবং মুসলমান জনসংখ্যা তথা মুসলমান ভোটার ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। বৃহত্তর বাংলাদেশ (ইসলামি) গঠনের চক্রান্ত চলছে জোরকদমে আর সংখ্যালঘু তোষণের নামে মুসলমান অনুপ্রবেশ ও ইসলামি জঙ্গিবাদ পশ্চিমবাংলায় তার ভিত গড়ে নিয়েছে।

সারা পৃথিবীতে বাংলাভাষী মানুষের সংখ্যাটা প্রায় ২৪ কোটি। এর মধ্যে হিন্দু রয়েছে ৮ কোটি আর মুসলমান রয়েছেন ১৬ কোটি অর্থাৎ হিন্দু বাঙালি হলো মোট বাঙালির ৩৩ শতাংশ যেখানে মুসলমান বাঙালি ৬৭ শতাংশ। ১৯৪৭ সালে হিন্দু বাঙালি ছিল ৪৬ শতাংশ আর আজ হিন্দু বাঙালি ৩৩ শতাংশ যার মানে সাড়ে ছয় দশকে হিন্দু বাঙালি ১৩ শতাংশ কমে গিয়েছে এবং এই হার চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে পশ্চিমবাংলায় হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে যাবে। উত্তরপূর্ব ভারতে অসমকে বাদ দিলে অন্যত্র হিন্দুরা সংখ্যালঘু, কাশ্মীর উপত্যকাও হিন্দুশূন্য। পৃথিবীতে অনেক খৃস্টান রাষ্ট্র রয়েছে, অনেক মুসলমান রাষ্ট্রও রয়েছে। কোনো খৃস্টান বা মুসলমান নিজেদেরকে ধর্মনিরপেক্ষ বলে না বা তাদের ধর্মপরিচয়কে অস্বীকার করে না অথচ আমাদের দেশের রাষ্ট্রনেতারা নিজেদের হিন্দু বলতে অনাগ্রহী এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নামে যেখানে যেমন সেখানে তেমন ভিত্তিতে সংখ্যালঘু তোষণ করেন আর ঠিক এখানেই নির্মিত হয়ে যায় সংখ্যালঘু সন্ত্রাসবাদের স্থায়ী ঠিকানা।

পশ্চিমবাংলা আজ সেই রকম একটা রাজ্যে পরিণত হয়েছে যেখানে সন্ত্রাসবাদ ঘাঁটি গেড়েছে শাসকদলের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক প্রশ্রয় ও আর্থিক মদতে। দেশভাগের সময় যখন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে লক্ষ লক্ষ হিন্দু শরণার্থী তাদের সর্বস্ব খুইয়ে এপার বাংলায় চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন তখন একটা দাবি উঠেছিল যে সমসংখ্যক মুসলমান নাগরিককে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিতে হবে যাতে শরণার্থী সমস্যা কমে আবার ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যায় ভারসাম্য থাকতে পারে। এই প্রস্তাবকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেহেরু উড়িয়ে দিয়েছিলেন ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র এই যুক্তিতে। সেদিন হিন্দু শরণার্থীদের পাশে নেহরু বা গান্ধীজী দাঁড়াননি। দাঁড়িয়েছিলেন একমাত্র শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং সেদিন অখণ্ড বাংলার সমস্ত হিন্দুকে মুসলিম রাষ্ট্রের অধীনে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে থেকে যাওয়া থেকে বাঁচিয়েছিলেন। যে মুসলমান তোষণ শুরু হয়েছিল গান্ধী-নেহরু জমানায় (যা হিন্দুদের বিপন্ন করেছিল) তা ৩৪ বছরের বাম জমানায় এবং তৎপরবর্তী তৃণমূল জমানায় আরো বেশি করে বেড়েছে এবং ইতিমধ্যে বৃহৎ বাংলাদেশের দাবি উঠেছে যা হবে ইসলামিক রাষ্ট্র।

এটা প্রমাণিত সত্য যে সারদা গ্রুপের অনেক টাকাই মুসলমান মৌলবাদীদের হাতে পৌঁছেছে যা ইসলামি বিচ্ছিন্নতাবাদকে আর্থিকভাবে পরিপুষ্ট করেছে। এই সন্ত্রাসবাদের আঁতুড় ঘর রাজ্যের মাদ্রাসাগুলিতে বিশেষ করে ব্যাঙের ছাতার মতো যত্রতত্র গজিয়ে ওঠা খারিজি মাদ্রাসাগুলো। কট্টরপন্থী গোঁড়া মাদ্রাসা শিক্ষা কখনোই মুক্ত চিন্তাবিদের জন্ম দেয় না কারণ সে শিক্ষায় বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদ, বিশ্বইতিহাস চেতনা, উদার সাহিত্য ও শিল্পচেতনা, প্রসারিত দার্শনিক চেতনার শিক্ষা দেওয়া হয় না যাতে শিক্ষার্থীরা তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব এবং যুগোপযুগী ব্যবহারিক ধর্ম সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে পারে। যে ধরণের শিক্ষা রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে দেওয়া হয় সেই ধরনের শিক্ষা খারিজি মাদ্রাসাগুলিতে দেওয়া হয় না বলেই ছাত্রছাত্রীরা শুধুমাত্র মুসলমানই হয়ে ওঠে, যথার্থ মানুষ হয় না এবং ভারতীয় জাতি হিসেবে নিজেদেরকে না দেখে ইসলামিক জাতি হিসেবে দেখতেই অভ্যস্ত হয়ে যায় যা একসময় বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম দেয়। সিদ্দিকুল্লার মতো ধর্মনেতারা সেই ধরনের মুসলমান মানবগোষ্ঠীকেই চায় নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে।

আমাদের দেশের ইসলামপ্রেমে

বিগলিত তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ নেতারা (কংগ্রেস, লালু, মুলায়ম, মায়াবতী, জয়ললিতা, নীতিশকুমার, সিপিএম, তৃণমূল সকলেই) মৌলবাদকে কোনো না কোনো ভাবে লালন-পালন অথবা প্রশ্রয় দিয়েছে এবং দিয়ে চলেছে যেটা ইসলামি মৌলবাদকে পুষ্ট হতে, বিকশিত হতে ও প্রসারিত হতে সাহায্য করছে। প্রতিবাদ যদি কেউ করে থাকে তবে সেটা বিজেপি। ভাষা-বর্ণ-উপজাতি-বিশেষ জনগোষ্ঠী-ধর্ম-প্রদেশ নির্বিশেষে অখণ্ড ভারতবর্ষ বা সমস্ত ভারতীয়দের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে সারা দেশে একই সিভিল কোড মেনে সমদৃষ্টিতে আইনের প্রয়োগ করবে। এটাই হওয়া উচিত যে কোনো গণতন্ত্র মেনে চলা দেশে এবং জাতীয়তাবাদী দল হিসেবে বিজেপি সে পথে চলতে চাইছে বলেই সব দল একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিজেপির ওপর। তাদের একটাই স্লোগান সাম্প্রদায়িকতার হাত থেকে ভারতকে বাঁচাতে হবে। আমাদের দেশের নেতারা হিন্দুদের ধর্মনিরপেক্ষ হতে পরামর্শ দিয়ে থাকেন কিন্তু মুসলমানদের ধর্মনিরপেক্ষ হতে বলেন না— সাহসে কুলোয় না।

ইসলামি মৌলবাদের ক্রমবিকাশ : আমাদের দেশে বিশেষ করে পশ্চিমবাংলায় ক্রমবর্ধমান ইসলামিক মৌলবাদ যা আমাদের জাতি, সমাজ ও দেশের সামনে ঈশান কোণে অশনি সঙ্কেতের আকার নিয়েছে তার জন্ম হয়েছিল ঊনবিংশ শতকে তিন শিক্ষিত, বিদগ্ধ ও ধনী মুসলমান বুদ্ধিজীবীর হাত ধরে যাঁদের নাম নবাব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী এবং সৈয়দ আহমেদ। এরা ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে চেয়েছিলেন এবং প্রতিটি মুসলমানকে প্রথমে মুসলমান হোতে বলেছিলেন, পরে অন্য কিছু। এরা বাংলার মুসলমানকে সম্প্রদায় সচেতন করে তুলেছিলেন এবং এদেরই হাত ধরে বাংলার মুসলমান সমাজ, বাংলা ভাষাকে ছেড়ে দিয়ে আরবি ও উর্দুর চর্চা শুরু করেছিল। আরেক মুসলমান নেতা চৌধুরী রহমৎ আলী লিখেছিলেন ''আমাদের মুসলমান মানুষদের ধর্ম, সংস্কৃতি, ইতিহাস, পঞ্জিকা, পুঁথি, পোশাক, আহার, ঐতিহ্য, সাহিত্য, স্থাপত্য, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, বিবাহ ব্যবস্থা হিন্দুদের থেকে মূলে আলাদা।''

একই আদলে ১৯৩৮ সালে জিন্নার ১৪ দফা দাবি ছিল চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িক। আমাদের দেশের শিক্ষিত মুসলমান ইতিহাসবিদেরাও যেমন ড. সাফাৎ আহমেদ, ড. কে এম আসরাফ, ড. মহম্মদ হাবিব হিন্দু আর মুসলমানরা আলাদা জাতি এই তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন। ইসলামি মৌলবাদের আদি জনক জামালউদ্দিন আল-আফগানীর কাছে থেকেই ধর্মান্ধ ইসলামি মৌলবাদের প্রেরণা লাভ করেছিলেন কবি ইকবাল। এরা সবাই ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে চেয়েছিলেন, তারা প্রতিটি মুসলমানকে প্রথমে মুসলমান হোতে বলেছিলেন, পরে অন্য কিছু। এরা বাংলার মুসলমানকে সম্প্রদায় সচেতন করে তুলেছিলেন এবং এদেরই হাত ধরে বাংলার মুসলমান সমাজ, বাংলা ভাষাকে ছেড়ে দিয়ে আরবি ও উর্দুর চর্চা শুরু করেছিল। এ রাজ্যের মাদ্রাসাগুলো এই পরম্পরার বাহক।

মুসলমান বুদ্ধিজীবী বনাম ধর্মনিরপেক্ষতা : স্যার সৈয়দ আহমেদ ১৮৭৫ সালে উত্তরপ্রদেশের আলিগড়ে মুসলমানদের জন্য আলাদা কলেজ তৈরি করেছিলেন, উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানেরা যাতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করে, কারণ তাঁর মতে হিন্দু ও মুসলমানেরা আলাদা জাতি। ১৮৮৬ সালে Mohamedan Educational Conference-এ, সৈয়দ আহমেদ দ্বিজাতি তত্ত্বের সূচনা করেন যার ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯০৬ সালে Mohamedan Vigilance Association লাল ইস্তাহারে লেখে— ''হে মুসলমানগণ ওঠো, জাগো, হিন্দুদের সঙ্গে এক স্কুলে পড়বে না, হিন্দুদের দোকান থেকে কিছু কিনবে না, হিন্দুদের ছোঁয়া কোনো জিনিস ধরবে না, কোনো হিন্দুকে কখনো সাহায্য করবে না বা চাকরি দেবে না।'' নবাব আমীর আলি খাঁ ছিলেন মুসলমানদের মধ্যে প্রথম রাজনৈতিক নেতা যিনি ১৮৮৭,সালে কলকাতায় National Mohamedan Association স্থাপন করেছিলেন ও পরে Mohamedan Literary Society। সবকিছুর মূল উদ্দেশ্য ছিল দ্বিজাতিতত্ত্বের সূচনা করা যার ভিত্তিতে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের জন্ম। আজ সেই মুসলিম লীগ ভিন্ন নামে, ভিন্ন কলেবরে, আমাদের স্বাধীন দেশের একটি প্রদেশে মহীরুহ হয়ে উঠেছে, সৌজন্যে প্রাক্তন সিপিএম সরকার এবং অধুনা তৃণমূল কংগ্রেস সরকার। পশ্চিমবাংলা আজ জিন্নার মুসলিম লীগের আধুনিক সংস্করণ।

পাকিস্তানের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক আসাফ এ ফায়জী লিখছেন— *(A Modern Approach to Islam)* "It is clear that we cannot go back to Koran, we have to go forward with it. I wish to understand the Koran as it was understood by the Arabs of the prophet only to interpret it and apply it to my conditions of life and to believe in it so far as appeals to me, 20th century man. I am bound to accept the message of Islam as a modern man and not as one who lived centuries ago".

দেখুন, একজন পাকিস্তানি মুসলমান কোরান প্রসঙ্গে যে কথাটা বলতে পারছেন, সেই সাহসটা কিন্তু আমাদের দেশে মুসলমান বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ নেতারা বলতে পারছেন না। কারণ একটাই— ভোটের ভয়। ■

জাতীয়তাবাদী বাংলা
সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান

সন্ত্রাসবাদ ও অনুপ্রবেশ

ড. প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এনডিএ সরকারের ছয় মাস অতিক্রান্ত। এই অল্প সময়ের মধ্যে নতুন সরকার অর্থনৈতিক সুস্থিতি আনার লক্ষ্যে সদর্থক ভূমিকা নিয়েছে। মুদ্রামূল্য হ্রাসের পাশাপাশি বিনিয়োগের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গি সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে নরেন্দ্র মোদী কঠোর মনোভাব নিয়েছেন। সন্ত্রাসের বিষয়ে আপোশ ও দোদুল্যমানতা নয়, চাই বলিষ্ঠ ও সক্রিয় প্রতিরোধ। কে না জানে কাশ্মীর সমস্যা থেকেই পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে সশস্ত্র হস্তক্ষেপের অপচেষ্টা করে চলেছে। এরপর ১৯৭০-এর দশকের শেষদিকে সন্ত্রাসবাদের গুণগত মাত্রা বৃদ্ধি পায়। বস্তুত পক্ষে আফগানিস্তানে সোভিয়েত রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণ খর্ব করার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসলামীয় মৌলবাদী কার্যকলাপে ইন্ধন জোগায়। মার্কিন অর্থ ও সামরিক সহায়তায় তালিবানদের আগমন হয়। আলকায়দা নামে জঙ্গিগোষ্ঠীর নেতা ওসামা বিন লাদেন সন্ত্রাসের ব্যূহজাল গড়ে তোলে। এবং পাকিস্তান ইসলামীয় সন্ত্রাসবাদের পীঠস্থানে পরিণত হয়।

ভারতে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের দু'টি পদ্ধতি দেখা যায়। পশ্চিমে ছায়াযুদ্ধ ও পূর্ব সীমান্তে অনুপ্রবেশ। পূর্ব সীমান্তে পশ্চিমবাংলা ও অসমে বাংলাদেশ (সাবেক পূর্ব পাকিস্তান) থেকে আগত অনুপ্রবেশকারীরা সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির ঢাল হিসেবে কাজ করে চলেছে। সম্প্রতি বর্ধমানকাণ্ডে প্রমাণিত হয়েছে বাংলাদেশ থেকে জেহাদি গোষ্ঠীর কর্মীদের আনাগোনা চলছে এবং পশ্চিমবাংলায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলিতে বিশেষত মুর্শিদাবাদ জেহাদি কার্যকলাপের আখড়ায় পরিণত হয়েছে।

কাশ্মীর সমস্যা : নেহরুর ভ্রান্তি

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই সদ্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযানের ছক কষে। কাশ্মীরকে কেন্দ্র করেই পাকিস্তান সশস্ত্র আক্রমণের পথে অগ্রসর হয়। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীর রাজ্যের মহারাজা হরি সিং ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে টালবাহানা করতে থাকায় ১৯৪৭ সালের ২২ অক্টোবর রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানি সেনা উপজাতি হানাদারবাহিনীর ছদ্মবেশে অতর্কিতে আক্রমণ শুরু করে। নিরাপত্তার স্বার্থে হরি সিং ২৬ অক্টোবর কাশ্মীরের ভারতে অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত নেন এবং তাঁর অনুরোধে ভারতীয় সেনা পাকিস্তানি হানাদারদের হটিয়ে দেয়। কিন্তু আপাত সমস্যার সমাধান হলেও কাশ্মীর নিয়ে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠল। এর মূলে ছিল প্রধানমন্ত্রী নেহরুর অদূরদর্শী ভ্রান্ত নীতি। তাঁর অনুসৃত চারটি পদক্ষেপ কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে তোলে।

প্রথমত, ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে কাশ্মীরে পাকিস্তানের আগ্রাসনের বিষয়টি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে পেশ করলেন। একটি আঞ্চলিক সমস্যা আন্তর্জাতিক রাজনীতির দাবা খেলার ঘুঁটিতে পরিণত হলো। দ্বিতীয়ত, জম্মু ও কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য গণভোটের প্রতিশ্রুতি দিলেন। এর সূত্র ধরেই পাকিস্তান কাশ্মীরের আত্মনিয়ন্ত্রণের অভিভাবক হয়ে উঠল এবং পরবর্তীকালে

কাশ্মীরে জঙ্গি মোকাবিলায় সেনা তৎপরতা।

জম্মু কাশ্মীর মুক্তিফ্রন্ট হিংসাত্মক পথে এই লক্ষ্য পূরণে অগ্রসর হয়। তৃতীয়ত, নেহরু শেখ আবদুল্লাকে মদত দিতে শুরু করেন। এর ফলে কাশ্মীরের বিশেষ অধিকারের রক্ষাকবচ হিসাবে সংবিধানে ৩৭০ ধারা অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু শেখ আবদুল্লা মনেপ্রাণে ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তি চাননি। মার্কিন বিদেশ দপ্তরের সঙ্গে স্বাধীন কাশ্মীর প্রসঙ্গে শলাপরামর্শ শুরু করেন। ইঙ্গ-মার্কিন মহল ধারবাহিকভাবে কাশ্মীর নিয়ে হস্তক্ষেপ করতে লাগল। চতুর্থত, পাক হানাদারদের সম্পূর্ণভাবে কাশ্মীর থেকে বিতাড়িত না করে একতরফাভাবে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেহরু কাশ্মীরের একটি অঞ্চল পাকিস্তানকে ভেট দিলেন। আজাদ

(অধিকৃত) কাশ্মীর নামে এই অঞ্চলটি জঙ্গি সন্ত্রাসবাদীদের ভারতবিরোধী নাশকতামূলক কার্যকলাপের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছে। নেহরুর ভ্রান্ত নীতির ফলে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান আজও নাগালের বাইরে।

১৯৪৭, ১৯৬৫ ও ১৯৭১ সালে পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে জড়িত হয়, কিন্তু প্রতিটি যুদ্ধেই পাকিস্তান পরাজিত হয়। ১৯৭১ সালের পর পূর্ব সীমান্তে বাংলাদেশ ও পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্তান প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের রণকৌশল পরিহার করে ছায়াযুদ্ধের পথ বেছে নেয়। ছায়াযুদ্ধ পরিচালনায় দু'টি কৌশল অনুসৃত হয়। একটি হলো অবৈধ অনুপ্রবেশের মাধ্যমে ভারতে জনসংখ্যার ভারসাম্য বিনষ্ট করার প্রচেষ্টা এবং অন্যটি হলো জঙ্গি মৌলবাদী সংগঠনের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ পরিচালনা। অষ্টম দশক থেকেই অনুপ্রবেশ ও সন্ত্রাসবাদের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। অনুপ্রবেশের বিষয়টি পূর্ব সীমান্তে বেশি মাথাচাড়া দিয়েছে। অসম ও পশ্চিমবাংলায় অনুপ্রবেশের ফলে মুসলমানদের জনসংখ্যা আশ্চর্যজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে অদূর ভবিষ্যতে আত্মনিয়ন্ত্রণের মুখোশে পুনরায় ভারত বিভাজনের অশনি সঙ্কেত দেখা যাচ্ছে।

সন্ত্রাসবাদী হামলার ক্ষেত্রে পাক বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগ এখন প্রমাণিত। পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আই বাংলাদেশে জঙ্গি গোষ্ঠীদের ট্রেনিং দেওয়ার কার্যক্রম শুরু করেছে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে লস্কর-ই-তৈবা, হুজি প্রভৃতি জঙ্গি সংগঠন ভারতের বিভিন্ন স্থানে পর্যায়ক্রমে নাশকতামূলক কার্যে লিপ্ত রয়েছে। এর পাশাপাশি ভারতে সিমি, ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন, প্রভৃতি জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যৌথভাবে অপকর্ম করে চলেছে। গত শতকের অষ্টম দশকের শেষ দিক থেকে আন্ত-সীমান্ত সন্ত্রাস ও দেশজ জঙ্গিদের তাণ্ডব সমান্তরালভাবে চলছে। বিগত কয়েক বছর বিশেষত ২০০৫ থেকে জঙ্গি হাঙ্গামার মাত্রা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। ২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বর মুম্বইয়ে ভয়াবহ জঙ্গি হানায় বিদেশিদের উপরেও আক্রমণ চালানো হয়। সাম্প্রতিককালে বর্ধমান কাণ্ডে (২ অক্টোবর ২০১৪) জঙ্গি কার্যকলাপের সঙ্গে বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশের বিষয়টি অঙ্গীভূত। ২০০৫ সালে সুপ্রিম কোর্ট অবৈধ অনুপ্রবেশের বিষয়ে সরকারি উদাসীনতার তীব্র সমালোচনা করে। পশ্চিমবাংলাতেও অবৈধ অনুপ্রবেশ অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। সীমান্ত অঞ্চলে অনুপ্রবেশকারীরা জঙ্গিদের এজেন্ট হিসাবে কাজ করে।

মুম্বই বিস্ফোরণ আন্তর্জাতিক মাত্রা ধারণ করেছে, কারণ বিখ্যাত তাজ হোটেলের সংঘর্ষে বিদেশি অতিথিদেরও জীবনহানি ঘটেছে। মুম্বই বিস্ফোরণের মাধ্যমে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় রাজনৈতিক নেতাদের শৈথিল্য ও প্রশাসনিক ব্যর্থতা সুপ্রমাণিত। জঙ্গি নাশকতামূলক কার্যকলাপ থেকে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার পরিকাঠামো অবিলম্বে পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। পাশাপাশি পূর্ব ভারতে অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর সাম্প্রতিক উত্তরপূর্ব ভারতে সফর, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও সামরিক তিন ধরনের রণকৌশল গ্রহণ করা আশু কর্তব্য।

প্রথমত, রাজনৈতিক নেতাদের ধর্মীয় জাতপাত ও আঞ্চলিক স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কোনোও বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রতি তোষণমূলক নীতি গ্রহণ করলে তা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হবে। দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানের অপকর্মের বিরুদ্ধে ভারতকে বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে যৌথভাবে চাপ সৃষ্টি করতে হবে। তৃতীয়ত, পাকিস্তান যদি সন্ত্রাস রোধে সদিচ্ছা না দেখায় তাহলে ওই দেশে আল-কায়দা, লস্কর-ই-তৈবা ও জইশে মহম্মদ প্রভৃতি উগ্র জঙ্গি সংস্থার ঘাঁটিগুলিকে নির্মূল করার জন্য অন্যান্য দেশের সঙ্গে মিলিতভাবে সামরিক অভিযানের পথ নিতে হবে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিশ্বের শান্তি ও সুস্থিতির জন্য জরুরি। আনন্দের কথা, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জঙ্গি সন্ত্রাসের দাপট হ্রাসের জন্য ইতিবাচক ভূমিকা নিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ায় সার্ক গোষ্ঠীর সম্মেলনে সন্ত্রাসবাদ দমনে যৌথ প্রচেষ্টার প্রস্তাব দিয়েছেন।

(লেখক ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট আর্কাইভের প্রাক্তন ডাইরেক্টর)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

সন্ত্রাস ও অর্থনীতি
কারণ ও ফলাফল

অম্লানকুসুম ঘোষ

কোনো দেশের অর্থনীতি তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছনোর পথে বিভিন্নরকম বাধার মুখোমুখি হয়। বিঘ্নের পরিমাণ ও ফলাফলের প্রসারের ওপর ভিত্তি করে এই বাধাগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলা যায় সন্ত্রাসবাদকে। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ কীভাবে ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষতির কারণ হচ্ছে তা একটু পর্যালোচনা করে দেখা যাক।

ভারতে সন্ত্রাসবাদের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর রূপ দেখা যায় কাশ্মীরে। আটের দশকের শেষ দিক থেকে কাশ্মীর সন্ত্রাসবাদের শিকার হয়ে চলেছে ক্রমান্বয়ে। এর ফল কাশ্মীরের অর্থনীতির ওপর কীভাবে পড়েছে দেখা যাক। কাশ্মীরের অর্থনীতি মূলত পর্যটন-নির্ভর, কারণ কুখ্যাত ৩৭০ ধারা মোতাবেক কাশ্মীরের বাইরের কেউ কাশ্মীরে জমি কিনতে পারে না, ফলে কাশ্মীরে কোনো শিল্পপতি শিল্পস্থাপন করতে পারেন না। শুধুমাত্র পর্যটন-নির্ভর হলেও কাশ্মীরের অর্থনীতি মোটেই দুর্বল ছিল না। কারণ কাশ্মীর পর্যটনের আদর্শ জায়গা। বিশ্বের বৃহত্তম হিমবাহ (কুমেরু ব্যতীত) সিয়াচেনের সমীপবর্তী কাশ্মীর শুধুমাত্র শৈলশহর হিসেবেই নয়, উদ্ভিদ-বৈচিত্র্যে ও বরফ পর্যটনে (স্কি) বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম। আটের দশক পর্যন্ত ভারতে আসা বৈদেশিক পর্যটকের আশি শতাংশ আসত শুধুমাত্র কাশ্মীর থেকে। সন্ত্রাস কবলিত কাশ্মীরে নয়ের দশকের থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত পর্যটক মন্দা বাজার রয়েছে, ভারতে মোট বিদেশি পর্যটকের মাত্র ১২.৫ শতাংশ এখন যায় কাশ্মীরে। একটু পরিসংখ্যানের দিকে চোখ ফেরানো যাক। ১৯৮৭-৮৮-তে কাশ্মীরে পর্যটন খাতে উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ ছিল ৭৩ কোটি ডলার, সন্ত্রাস কবলিত ১৯৯২-৯৩-তে তা কমে দাঁড়ায় ১৪ কোটি ডলারে। গত অর্থবর্ষে এই পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫০০ কোটি ডলার। অর্থের পরিমাণের দিক দিয়ে বাণিজ্যের পরিমাণ কিছুটা বাড়লেও অর্থের প্রকৃত-মূল্য অনুসারে (Real money value) বাণিজ্য কিন্তু হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে অনেকটাই। পাশাপাশি ভূপ্রাকৃতিক ও আবহাওয়াগতভাবে কাশ্মীরসদৃশ সুইজারল্যান্ডের কথা আলোচনা করা যাক। আটের দশকে সুইজারল্যান্ডের পর্যটন খাতে আয় ছিল বছরে গড়ে হাজার কোটি ডলারের কাছাকাছি। বর্তমানে তা দাঁড়িয়েছে প্রায় এক লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার কোটি ডলারের কাছাকাছি। বৃদ্ধির হারের সঙ্গে কাশ্মীরের বৃদ্ধির হারের তুলনা করলে তফাতটা সহজেই বোঝা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আটের দশকের ভারত লাইসেন্স নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির অধীনে ছিল, আর আজকের ভারত উদার অর্থনীতির ধারক ও বাহক। উদারিকরণের যুগে অবাধ প্রবেশের মুখোশ নিয়ে বিদেশি পর্যটক আকর্ষণ করা যথেষ্ট সহজ। টাকার ক্রমাগত অবমূল্যায়নে পাশ্চাত্যের কাছে সহজলভ্য ও সস্তার ভ্রমণক্ষেত্র হিসেবে কাশ্মীর সুইজারল্যান্ডের থেকে অনেক বেশি পর্যটক টানতে সফল হোত। কিন্তু সন্ত্রাস সে পথে বাধা হিসেবে আছে। যদি সে বাধা না থাকত, যদি সত্যিই সুইজারল্যান্ডের মতো বা তার কাছাকাছি সংখ্যায় পর্যটক আকর্ষণ করতে সক্ষম হোত ভারত, তাহলে গোটা দেশের জাতীয় আয়ের চিত্রটাই বদলে যেত। পর্যটন ছাড়াও কাশ্মীরের কৃষিজাত উৎপন্ন বস্তু বাজারজাত করা ও রপ্তানি করার কাজও ব্যাহত হচ্ছে উগ্রপন্থী কার্যকলাপের জেরে। পেস্তা, আপেল ইত্যাদি অত্যন্ত দামী ফল ও চেরী ডেইজি ইত্যাদি অত্যন্ত দামী ফুল রপ্তানি করলে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সম্ভাবনা কতটা বাড়ত তা সর্বজনবিদিত। এছাড়া নততল-আকৃতি বিশিষ্ট কাশ্মীরি পাহাড়ি এলাকায় উন্নতমানের চা চাষ শুরু করার বিপুল সম্ভাবনা বর্তমান, যদিও দীর্ঘমেয়াদি সে পদক্ষেপ করার কথা বর্তমানের সন্ত্রাসদীর্ণ কাশ্মীরে কল্পনারও অতীত।

ভারতে মোট বিদেশি পর্যটকের মাত্র ১২.৫ শতাংশ এখন কাশ্মীরে যায় । একটু পরিসংখ্যানের দিকে চোখ ফেরানো যাক। ১৯৮৭-৮৮-তে কাশ্মীরে পর্যটন খাতে উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ ছিল ৭৩ কোটি ডলার, সন্ত্রাস কবলিত ১৯৯২-৯৩-তে তা কমে দাঁড়ায় ১৪ কোটি ডলারে। গত অর্থবর্ষে এই পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫০০ কোটি ডলার।

সন্ত্রাসের আর এক লীলাভূমি উত্তর-পূর্ব ভারতের দিকে তাকানো যাক। নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা ও অসম উত্তর-পূর্বের সাত বোনের মধ্যে এই ছয় বোন অর্থাৎ ছটি রাজ্য সন্ত্রাসের নিয়মিত শিকার। অথচ ভৌগোলিক কারণে বনজ, খনিজ ও পানীয় জলের বিপুল সম্পদে সমৃদ্ধ এই রাজ্যগুলি। ঝুমচাষ ছাড়া অন্য কোনোরকম নিয়মিত শস্যচাষ সম্ভব না হলেও পেলাকিয়া, লঙ্কা ইত্যাদি বিভিন্নরকম দামী বনজ খাদ্যবস্তু এই রাজ্যগুলিতে প্রচুর পরিমাণে হয়। কিন্তু তা সংগ্রহ বাজারজাত, পরিবহণ ও রপ্তানি প্রতি ক্ষেত্রেই চীনের প্রাচীরের মতো বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে সন্ত্রাস। নানারকম ধাতুর খনিতে পূর্ণ মূলত ভঙ্গিল পর্বতের দ্বারা গঠিত এই রাজ্যগুলি। কিন্তু উত্তোলন দূরে থাক, তার অনুসন্ধান করার সম্ভাবনাও বন্ধ করে রেখেছে নিরবচ্ছিন্ন সন্ত্রাস। গাঙ্গেয় সমভূমির ঠিক উত্তরে বিপুল উচ্চতায় অবস্থিতির কারণে মৌসুমীবায়ুর গতিপথ বাধাপ্রাপ্ত হয় ঠিক এখানেই, ফলে প্রচুর বৃষ্টিস্নাত হয় প্রতি বছরই এখানকার প্রান্তর। মৌসিনরাম বা চেরাপুঞ্জী শুধু নয় সমগ্র এলাকাটিই ইন্দ্রদেবের কৃপাধন্য। বর্তমানে সমগ্র বিশ্ব যখন পানীয় জলের সম্ভাব্য অভাবের ভয়ে ভীত, যখন আগামী শতাব্দীর বিশ্বযুদ্ধ পানীয় জলের জন্য হওয়ার কথা, তখন এই বিপুল পরিমাণ পানীয় জলের ব্যবসায়িক ব্যবহার দেশের অর্থনীতিকে করতে পারত অত্যন্ত সমৃদ্ধ। সমুদ্রপৃষ্ঠের তুলনায় প্রচুর উচ্চতায় এই জলের অবস্থানের জন্য জলবিদ্যুৎ উপাদনের সম্ভাবনাও প্রচুর, কিন্তু সব সম্ভাবনারই বাস্তবায়ণের পথে একমাত্র বাধা এখানে সন্ত্রাস। অথচ পাশাপাশি এই অঞ্চলেরই আরেক রাজ্য অরুণাচল প্রদেশের দিকে চোখ ফেরানো যাক। সন্ত্রাসের শনিরদৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ায় এই রাজ্যটি অন্তত জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে ও পর্যটনে এবং বনজ সম্পদের বাণিজিকরণে চূড়ান্ত সফল। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে অরুণাচল প্রদেশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন হবে দেড় লক্ষ মেগাওয়াট। যা গোটা বিশ্বের মোট উৎপাদিত পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির প্রায় অর্ধেক। ভাবতেও অবাক লাগে সন্ত্রাসের কালো ছায়া না থাকলে ছ'টি রাজ্য এই উন্নতির রথে সওয়ার হতে পারত, হচ্ছে না কিছু অপ্রয়োজনীয় কারণে।

বিশ্লেষণ করে দেখা যাক, সন্ত্রাস-বাধায় যে উন্নয়নের সারণী তৈরি করা গেল না আজও, তা তৈরি করা গেলে আজ জাতীয় অর্থনীতিতে আমরা কি পরিবর্তন লক্ষ্য করতাম। প্রথমত, জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেত প্রচুর, যার সুফল ভোগ করত আপামর ভারতবাসী। দ্বিতীয়ত, রপ্তানি বৃদ্ধি পেত, যার ফলে দেশের বাণিজ্য ঘাটতি (Current A/C deficit) হ্রাস পেত। তৃতীয়ত, বৈদেশিক মুদ্রা আরও বৃদ্ধি পেত, ফলে সরকারের বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয়ও বাড়ত এবং প্রয়োজনে টাকার মান নিয়ন্ত্রণে এবং বিদেশি প্রযুক্তি আমদানিতে এবং পরিকাঠামো নির্মাণে সহায়ক হোত যা দেশের অর্থনীতিতে সুদূরপ্রসারি প্রভাব ফেলত। চতুর্থত, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেত, যার ফলে একদিকে বেকারি কমে সমাজবিরোধী কাজের সংখ্যা কমাত, অপরদিকে দেশবাসীর ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেত। চাহিদা অর্থাৎ সামগ্রিক ভোগ্যপণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধি পেত ফলে উৎপাদনও বাড়ত অর্থাৎ জাতীয় উৎপাদন আরও বাড়ত। এই বর্ধিত উৎপাদন একই পদ্ধতিতে ক্রয়ক্ষমতা বাড়াত অর্থাৎ একই পদ্ধতিতে জাতীয় উৎপাদন আরও বাড়ত। এভাবে উন্নতির চক্রাকার সোপানে উপনীত হোত জাতীয় অর্থনীতি। পঞ্চমত, সরকারের করজনিত আয় বৃদ্ধি পেত। এর ফলে সরকারি আয়-ব্যয় ঘাটতি (Fiscal deficit) হ্রাস পেত। ফলস্বরূপ সরকারের পরিকল্পনা খাতে খরচ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেত। দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে যা অর্থনীতির ভিতকে করে তুলত অত্যন্ত মজবুত।

সন্ত্রাসজনিত কারণে উপরিউক্ত সুফলগুলি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে জাতীয় অর্থনীতি, যার ফলে আবার পুষ্ট হচ্ছে সন্ত্রাস। অত্যন্ত আশ্চর্যের হলেও একথা সত্য। জাতীয় অর্থনীতিতে উৎপাদন বৃদ্ধি ও বৈদেশিক আয়-বৃদ্ধির জোয়ার না থাকায় দেশের পিছিয়ে থাকা অংশের উন্নতি করা সম্ভব হয়নি দীর্ঘদিন ধরেই। মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, অন্ধ্রপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের সেই সব পশ্চাৎপদ, পাহাড় ও অরণ্য সঙ্কুল এলাকায় সেই অনুন্নয়নের সুযোগে গেড়ে বসেছে সন্ত্রাসবাদের নবতম অধ্যায়— মাওবাদ। চীনের বাতিল হয়ে যাওয়া একটি মতবাদকে আশ্রয় করে সেই সন্ত্রাসবাদীরা বিদেশিদের অর্থে পুষ্ট হয়ে (মূলত চীন) সেই অর্থকে টোপ হিসেবে এবং সেই অর্থ দ্বারা ক্রীত অস্ত্রকে বঁড়শি হিসেবে ব্যবহার করে সেখানকার দরিদ্র সরল মানুষকে সন্ত্রাসবাদীতে পরিণত করছে। এই নবগঠিত সন্ত্রাসবাদীরা বর্তমানে দেশের আশিটি জেলায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। বর্তমানে সরকারের ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সেইসব জেলায় পরিকাঠামোগত উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই জেলাগুলি কৃষিতে অনুন্নত হলেও বনজ ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। সেই সম্পদের সঠিক ব্যবহার করাও তাই হয়ে পড়ছে অসম্ভব। ফলে দেশের অর্থনৈতিক ধমনীতে তাজা রক্তের ন্যায় অধিক উৎপাদন থেকে যাচ্ছে অধরাই। এই উপদ্রুত এলাকাগুলিতে মোট তিরিশ লক্ষ কোটি ডলারের খনিজ সম্পদ নিহিত রয়েছে। যদিও সময়সাপেক্ষ, তবুও একথা অনস্বীকার্য যে এর সঠিক ব্যবহার শুধু এই অঞ্চলের নয়, সমগ্র দেশের অর্থনীতির পরিবর্তন ঘটাতে পারত। ফলে দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে মাওবাদ আর মাথাচাড়া দিতে পারত না। কিন্তু তা না হওয়ায় এক অদ্ভুত দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে তলিয়ে যাচ্ছে দেশের অর্থনৈতিক এবং মানবসম্পদ। দুষ্টচক্রটি এইরূপ— অনুন্নয়ন থেকে দারিদ্র্য, দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে মাওবাদ, ফলে আরও অনুন্নয়ন, আরও দারিদ্র্য, আরও মাওবাদ। এর শেষ কোথায় তা বলা কঠিন।

চোখ বন্ধ করে থাকলে প্রলয়কে ঠেকানো যায় না। আবার প্রলয় আসছে দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে থাকলেও প্রলয়ের হাত থেকে বাঁচা যায় না। প্রয়োজন প্রলয়ের প্রতিরোধ করা। এক্ষেত্রেও তাই সন্ত্রাসবাদরূপ ভয়ঙ্কর বিপদ যাতে সর্বগ্রাসী আগুনের মতো জাতীয় অর্থনীতিকে সর্বতোভাবে না গ্রাস করতে পারে তার জন্য সচেষ্ট হতে হবে সকলকেই। বুদ্ধিজীবীদের কলম হাতে, আইনরক্ষকদের ন্যায় দানে এবং রাষ্ট্র পরিচালকদের রাজদণ্ড হাতে আপ্রাণ লড়াই করতে হবে এদের বিরুদ্ধে। সৌভাগ্যবশত কেন্দ্রে এখন জাতীয়তাবাদী সরকার— কঠোর হস্তে, পুরস্কার-তিরস্কার নীতি নিয়ে, স্থানীয় স্তরে দুর্নীতিদমন করে ও প্রচুর উন্নয়ন ঘটিয়ে, এই বিপদকে দমন করতে হবে। এ কাজে যদি কেন্দ্র সফল হয় তবে দেশের সোনালি ভবিষ্যৎ আগতপ্রায়, দেশের মসীজীবীরা তাদের প্রশংসিত করবে মুক্তকণ্ঠে। ■

চিঠিপত্র

সংস্কৃত শিক্ষার পক্ষে

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারি বিদ্যালগুলির পাঠক্রমে 'জার্মান' ভাষার পরিবর্তে সংস্কৃতকে তৃতীয় ভাষা করা হয়েছে। সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে বাদানুবাদ ভারতের সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত গড়ায়। সরকারি সিদ্ধান্তের কোনো পরিবর্তনের আদেশ আদালত দেননি— সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতায় তা সম্ভবও নয়। বরং সরকার স্বচ্ছতার সঙ্গে আদালতকে জানিয়েছে— এবছর সংস্কৃত পাঠদান হলেও বিদ্যালয়গুলিতে কোনো পরীক্ষা নেওয়া হবে না।

প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালে নবনির্বাচিত সরকার আবশ্যিক সংস্কৃত পাঠদানের যে সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে, সেটি কেন্দ্রীয় ১৯৫৬ সালের সংস্কৃত আয়োগের প্রস্তাবকে কার্যকরী করেছে। ১৯৪৯ সালের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা-আয়োগ এবং ১৯৫৩ সালের মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগ দ্ব্যর্থহীন ভাবে আবশ্যিক সংস্কৃত শিক্ষায় প্রস্তাব করেছে। আবশ্যিক সংস্কৃত শিক্ষার যাঁরা সর্বাধিক বিরোধী— শিক্ষায় গৈরিকীকরণ বলছেন সেই কংগ্রেসীরা হয়ত এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ যে, স্বাধীনোত্তর ভারতে কংগ্রেস সরকারের আমলে এই ধরনের অন্তত দশ-বারোটি কমিশন তৈরি হয় আধুনিক সংস্কৃত শিক্ষার পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরীক্ষার জন্য। সেই সব কমিশনের প্রস্তাব কখনই মান্যতা পায়নি। আসলে কংগ্রেসীরা জানেনেই না যে, পণ্ডিত নেহরু ১৯৪৯ সালের Constituent Assembly-র বিতর্কে বলেছিলেন— If I was asked what is the greatest treasure which India posesses and what is her finest heritage. I would answer unhesitatingly–it is the Sanskrit Language and literature and all that it contains. This is a maginificient inheritance and so long as this endures and influences the life of an people, so long the basis genius of India will continue. অবিরাম সংস্কৃত শিক্ষার দ্বারাই তা সম্ভব।

ঔপনিষদিক 'সত্যমেব জয়তে' National Motto রূপে গৃহীত হয়। লোকসভার Motto স্থির হয়--- 'ধর্মচক্রপ্রবর্তনায়', এবং সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের Motto-'যতঃধর্মস্ততঃজয়ঃ'। জাতীয় জীবনে Mr. ও Mrs.-এর স্থানে শ্রী এবং শ্রীমতী ব্যবহার নির্ধারিত করা হয়। এসবই সংস্কৃত দ্বারা অনুপ্রাণিত। ১৯৯৪ সালের একটি রায়ে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত আবশ্যিক সংস্কৃত শিক্ষার উপর জোর দেন। আজকের ভারতের ছাত্রছাত্রীদের জীবন্ত প্রেরণাস্রোত পূর্বতন রাষ্ট্রপতি ড: এ. পি. জে. আব্দুল কালাম ২০০৭ সালের ১ ফেব্রুয়ারি সংস্কৃত ছাত্র-ছাত্রীদের বলেন— ''Sanskrit is a beautiful Language. It has enriched our society from time immemorial. Today many nations are trying to research Sanskrit writings which are there in our ancient scriptures. I understand that there is a wealth of knowledge available in Sanskrit which scientists and technologists are finding today."

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে আবার সংস্কৃত শিক্ষা নিশ্চয়ই আবশ্যিক হোক— এ রাজ্যের ভবতোষ দত্ত কমিশন ও অশোক মিত্র কমিশনের প্রস্তাব অনুসারে।

—অভিজিৎ চক্রবর্তী,
কলকাতা-৬।

বঙ্গের বিজিপিতে বেনোজল

আবার দলবদলের হিড়িক পড়েছে বাংলার রাজনীতিতে। তিন বছর আগেও দলবদলের হিড়িক পড়েছিল— পূর্বতন শাসক দল বামফ্রন্ট থেকে বর্তমানের তৃণমূল দলে। সেই দলত্যাগের ধারা অব্যাহত থাকলেও গতি বড়ই শ্লথ। এখন দলবদলের ধারার অভিমুখ ভারতীয় জনতা পার্টি। যে নেতা-নেত্রী দল বদলের খেলায় মেতেছেন তাঁরা কারা? কেন খেলছেন এমন রাজনৈতিক পরিব্রাজনের খেলা? জনসেবার কথা তাঁদের মুখে। সত্যই কি জনসেবার জন্য তাদের এই দল বদলের রাজনীতি? নাকি দুর্নীতি, অত্যাচার, স্বজনপোষণ করে নিজের দলে 'আবর্জনা' হয়ে পড়েছেন। নতুনভাবে 'কেরিয়ার' গড়তে 'রাজনৈতিক জামা' বদল করছেন এই সমস্ত 'অচল পয়সা' নেতা-নেত্রীগণ। বিজেপি-র বর্তমান কার্যকর্তারা কি ভাবছেন? নাকি এসব 'হামবড়া' গোছের ধানের তক্তা দিয়ে নিজেদের শক্তি দেখানোর অপচেষ্টা চালাচ্ছেন? ভাববেন না একবার 'দুষ্ট গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো'?

এ সমস্ত দলত্যাগী তথা বিশ্বাসঘাতকরা বিজেপি-র অসময়ে যে নতুন কোনো সুবিধাবাদী দলে নাম লেখাবে না তার নিশ্চয়তা কে দেবেন? বিজেপি-তে এরা যখন ছিলেন না, এদের ভোটাররা এদেরকেই অস্বীকার করে বিজেপিকে ভোট দিলেন। তাহলে জনতার ভোট পেতে এদের কোলে তুলে নাচার দরকার কি? জনতা যাকে 'যেমন কুকুর, তেমন মুগুর' দেখিয়ে ভোট বঞ্চিত করলো, তাকেই নেতা মানতে হবে কেন?

জনতার বুকে একরাশ হতাশা ও ব্যথা। ৩৪ বছর একটানা অত্যাচারিত, বঞ্চিত হয়ে সবেমাত্র স্বাধীনতার আশা করেছিল। অথচ 'যে যায় লঙ্কায়, সে হয় রাবণ' প্রবাদকে সত্য প্রমাণ করে রাজা নিরো এবং মহম্মদ বিন তুঘলকের মতো রাজ্য চালাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মানুষের আশার মুখে ছাই দিয়ে এক-নায়িকার মতো চলছেন বাংলার অগ্নিকন্যা। ৩৪ বছরের তিক্ত স্বাদ ৩৪ মাসেই জনতা আবার পেয়ে গেছে। তাই ভারতীয় জনতা পার্টিকে সমর্থন দিয়ে নতুন ভোরের স্বপ্ন দেখছে বাংলা। লক্ষ্য রাখতে হবে, তৃণমূল কংগ্রেসের মতো ভারতীয় জনতা পার্টিও যেন রাজনৈতিক জঞ্জালের 'ডাস্টবিন' না হয়ে ওঠে। আবর্জনার দুর্গন্ধে যেন রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত ১৭ শতাংশ ভোটার পালিয়ে 'নোটা'তে আশ্রয় না নেন।

—বরুণ মণ্ডল,
রাণাঘাট, নদীয়া।

পরিবর্তনের গঙ্গাযাত্রা

অম্লান মুকুর মিত্র

ঘানার শাসক এন্‌ক্রুমা'র ঢাউস সিংহাসনের পিছনে একটা আফ্রিকার মানচিত্র ছিল। সেখান থেকে উঠে আসছে এক ভিড় কালো মানুষ। আর তিনদিকে তিনজন সাহেব ছুটে পালাচ্ছে! তাদের কোট আলগা, টাই উড়ন্ত— সুটকেসে লেখা ১. ধর্মযাজক, ২. সাম্রাজ্যবাদী ঋণদান সংস্থা এবং ৩. নৃতাত্ত্বিক। আফ্রিকার স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যেমন যেমন বেড়েছে তেমনি তেমনি এরা পালানোর পথ খুঁজে পায়নি! পশ্চিমবঙ্গের চিত্রটিও প্রায় একই রকম। ছবিটিতে থাকবে বাংলার দশকোটি মানুষের উত্থানের ইঙ্গিত। আর পলায়নপর তিনটি মুক্তকচ্ছ মানুষের ছবির সঙ্গে ঝোলানো ব্যাগ উড়ে যাবে। সেগুলির উপর লেখা থাকবে ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬! শেষ ছবিটি দেখে বোঝা যাবে তার শাড়ি ফাটা— আঁচল মলিন, পায়ে হাওয়াই চপ্পল।

কথা হচ্ছিল এক অধ্যাপকের সঙ্গে। ভদ্রলোক বলছিলেন আমরা প্রতারিত। কেন? আমরা যারা সিপিএম-এর অন্যায় অসৎ প্রবৃত্তি— অহঙ্কার সহ্য করিনি, তাদের ঠকিয়েছেন ভদ্রমহিলা। সারা বাংলায় ছেয়ে গেছে তাঁর আশ্চর্য সরল হাসিমাখা মোলায়েম মুখ— হাওয়াই চপ্পল পরা সেই পূর্ণায়তন কাট আউটগুলোর নিচে লেখা থাকত 'সততার প্রতীক'! তা দেখে আমরা ভুল করে ভেবে নিয়েছিলাম এই তো বাংলার নতুন রাজনীতির কাণ্ডারি। বামপন্থীদের অশ্লীল কথাবার্তা শুনে কানে তালা দিতে ইচ্ছা হোত। মনে হোত ভদ্রমহিলা সততার প্রতীক! এক সময় তাঁর নামের সামনে ডক্টর লেখা থাকত— সে ডক্টর তিনি কোথায় পেয়েছিলেন? জানা যায়নি কোনোদিন। শেষে সততার প্রতীক সততার জন্যই ওই ডক্টর ডিগ্রির আর উল্লেখ করেননি। একি কম সততা! কিন্তু আমরা যারা নানা ক্ষেত্রে সামান্য হলেও প্রতিবাদ করেছি তাদের লড়াই সংগ্রামকে তিনি তামাশা বলেছেন। সততার প্রতীকের ধাক্কার ডামাডোলে আমাদের লড়াইগুলো অপমানিত হলো! সারদার গরিব মানুষদের টাকা লুঠে নেওয়ার চেয়ে এই লুণ্ঠনের পরিমাণ কিছুমাত্র কম নয়।

এক মহিলা— আমাদের বাড়ির গৃহকর্মে সাহায্য করেন যে মহিলা তাঁর মেয়ে। তাঁর সর্বস্ব লুঠে নিয়েছে সারদা চিটফান্ড। এবং সেই চিটফান্ডের কর্তাদের শাসিয়ে চমকে ধমকে যারা টাকা যোগাড় করেছে— একটা গাড়িতে কিছুদিন চড়ে অন্য গাড়ির বায়না দিয়েছে— তারা কেমন মানুষ? আমাদের কাজের মাসির মেয়ের অল্পদিনে বেশি টাকার লোভ হয়েছিল। টাকাটা গচ্চা গেছে। তাঁকে বোঝবার ভাষা নেই— কি করে বলব তেমনি ভাবে প্রতারিত হয়েছেন অনেকে। সাকুল্যে তাদের সংখ্যা হলো ষোল লক্ষ! কষ্টেসৃষ্টে মজুর খেটে জমানো টাকা তাঁদের খেয়ে গেল একদল বদমায়েস। একশোর মতো মানুষ আত্মহত্যা করতে বাধ্য হলেন! চোরের উপর বাটপাড়ি করার নাম সততার প্রতীকের রাজনীতি! বাংলার মানুষ এমন ডাকাতরানী কোনোদিন দেখেনি। তাই আসছে ২০১৪-২০১৫-২০১৬! রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আছে 'কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও'?

বামনেতাদের মুখে বাজেকথা শোনার সময় মনে হোত ওরা পুরুষমানুষ তাই বলেন এসব। সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত বিশেষজ্ঞরা তেমনি বলে থাকেন অবশ্য। অপভাষা প্রয়োগের সময় নাকি যৌন আকাঙ্ক্ষার বিকৃত প্রকাশ ঘটে। অবদমিত আকাঙ্ক্ষা প্রতিসৃত হয়ে তৈরি করে গালাগালির নর্দমা বা আবর্জনা কুণ্ড! কিন্তু কোনো মহিলা যখন এসব কথা বলেন? তখন তাঁকে কি বলা যাবে? সমাজতত্ত্ব বা মনস্তত্ত্ব এসবের তল পায় না— থম মেরে যায়। ঘাস কখন বাঁশ হয়ে যায় বোঝে এমন সমাজতত্ত্ব পৃথিবীতে আজও হয়নি। বাঁশ কখন হয়ে যায় বাম্বু তা বোঝানোর মতো কোনো মনস্তত্ত্ব আজও গড়ে ওঠেনি। রাজনীতির যেখানে শেষ সেখানে শুরু গুণ্ডানীতি। গুণ্ডানীতির প্রধান লক্ষ্য চুরি-জোচ্চুরি-বাটপাড়ি-রাহাজানি। বাংলায় এইসবই রাজনীতির নামে চলছে। চুরি-বাটপাড়ির মধ্যে শিল্পশোভন চালাকি যুক্ত করে সততার প্রতীক একটি আশ্চর্য মাল বাজারে ছেড়েছেন। মালটিকে বলা যেতে পারে পরের ধনে পোদ্দারি। সারদার টাকা খুইয়ে ষোল লক্ষ মানুষ যখন কাতরাচ্ছেন— আত্মহত্যা করছেন— পথ খুঁজে পাচ্ছেন না, তখন ভদ্রমহিলা বসালেন শ্যামল সেন কমিশন। তাতে টাকা দিলেন কিছু! বলেছিলেন পাঁচশো কোটি টাকা দেবেন। ততটা দিলেন না। সাধারণ মানুষকে বললেন বেশি বেশি করে সিগারেট খান— তাতে করের পরিমাণ বাড়বে! বাঃ বেশ! এর আগেও একবার বিষমদ খেয়ে লোক মারা গেলে সততার প্রতীক করলেন কি— না সবাইকে দু' লক্ষ করে টাকা দিলেন। অর্থাৎ সিগারেট খেয়ে পয়সা যোগাড় হোক— মদ খেয়ে মারা যাওয়া লোককে সেখান থেকে দেওয়া হবে ঘাট খরচা! খুড়োর কল আর কাকে বলে! রাজ্যটার সর্বত্র সিগারেট ফোঁকা, মদ খাওয়া লোকরা বুক ফুলিয়ে বুকে মুখে ঘাস ও হাতে বাঁশ নিয়ে দাঁড়াক আরকি। সারদা কোম্পানি টাকা চুরি করুক— সাধারণ মানুষকে টাকা দেবার ব্যবস্থা করা হোক করের টাকা ফাঁকা করে! এমন অর্থনীতির কি নাম দেওয়া যায়? অমর্ত্য সেন মশাইরা একটু ভেবে দেখবেন। আমরা নাম দিলাম গবেট অর্থনীতি। দূর ইতিহাসে এই অর্থনীতি চালু করেছিলেন হবুচন্দ্র রাজা। তাই এন্‌ক্রুমা'র সিংহাসনের পিছনের ছবিটা 'সটাসট' এঁকে ফেলুন দিদিমণি—২০১৪-২০১৫-২০১৬। একটি স্বপ্নের গঙ্গাযাত্রা হলো 'মহাকরণ' টু 'নবান্ন'-এর মধ্যে। এমন প্রতারণা বাংলা কোনোদিন দেখেছে কি? ■

রামাবতার : রাক্ষস সংস্কৃতির অবসান

ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার

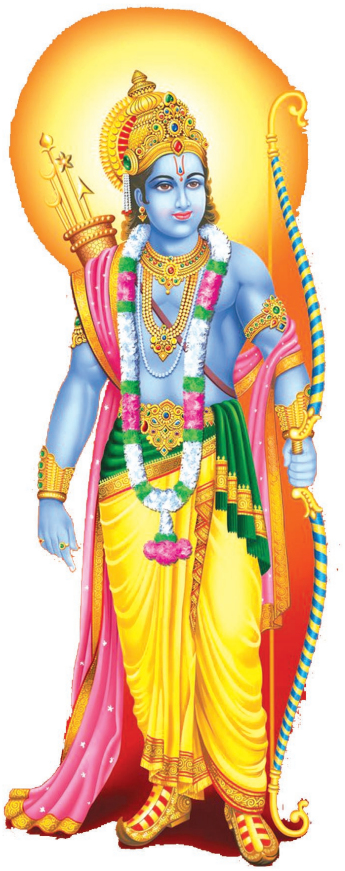

ভগবান বিষ্ণুর সপ্তম অবতার শ্রীরামচন্দ্র। কান্তকবি জয়দেব তাঁকে এইভাবে অঙ্কন করেছেন—

'বিবতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতি কমনীয়ং
দশমুখ মৌলিবলিং রমণীয়ম্
কেশবধৃত রঘুপতিরূপ জয়জগদীশ
হরে।।'

ইনি দশদিকপালের আকাঙ্ক্ষিত রাবণের মস্তকরূপ রমণীয়বলি দশদিকে বিতরণ করেছিলেন। অর্থাৎ রাক্ষসরাজ রাবণকে যুদ্ধে বধ করেছিলেন। ভারতীয় সমাজে রামচন্দ্রের আরও একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হলো— সুশাসন, রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা। আজও সুশাসিত রাজ্যের নাম 'রামরাজ্য'।

ঋষি বিশ্বামিত্রের সাহচর্যে ছেলেবেলা থেকেই রাম-লক্ষ্মণ ভারতীয় রাজনীতি পাঠের প্রচুর সুযোগ পেয়েছিলেন। তাই ছেলেবেলা থেকে রাক্ষস সংস্কৃতির ধ্বংসের জন্য তাঁরা নিজেদের উৎসর্গ করেন। তাড়কা রাক্ষসী বধ তার প্রমাণ। বিশ্বামিত্র তাঁদের শুধু শাস্ত্রশিক্ষা দিয়েই ক্ষান্ত হননি; শস্ত্রশিক্ষাও দিয়েছিলেন। সারাদেশের পরিস্থিতি বিশ্বামিত্রের ভালোভাবেই জানা ছিল। তখন দেশের পরিস্থিতি অত্যন্ত বিচিত্র ছিল। ঋষিদের প্রায় সকল আশ্রম বন্ধ ছিল। রাক্ষসদের উৎপাতে ও আতঙ্কে যাগযজ্ঞাদি করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। কোথাও বেদপাঠ হোত না। রাক্ষসদের অত্যাচারে সমগ্র জনসাধারণ ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। ধনধান্য পুষ্পভরা বসুন্ধরা রাবণের রাক্ষসেরা শ্মশান করে তুলেছিল। রাক্ষসদের উৎপাতে স্থানে স্থানে নরকঙ্কালের স্তূপ জমে উঠেছিল। বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে এই রাক্ষস নিধনের কাজে নামলেন। প্রথমেই তিনি রাম-লক্ষ্মণকে দিয়ে তাঁর যজ্ঞ রক্ষার কাজ করেছিলেন। তাতে মুনিঋষিরা তাঁদের সুখ্যাতি করতে লাগলেন, আর তাঁদের খ্যাতিও চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

বিশ্বামিত্র ইতিমধ্যে রাম-লক্ষ্মণকে আরও পারদর্শী করে তুললেন। নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষা দিয়ে রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করার যোগ্য করলেন। শ্রীরামকে নিয়ে তারপর বিশ্বামিত্র জনকপুরীতে গেলেন। সেখানে হরধনু ভঙ্গ করে শ্রীরাম সীতাদেবীকে বিবাহ করলেন। হরধনুটি পরশুরাম জনকরাজার কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন। এই ধনুভঙ্গের মধ্যে দিয়ে শ্রীরাম নিজেকে লোকসমাজে প্রচার করলেন। শ্রীরামের অলৌকিক সামর্থ্যের কথা জনসমাজে প্রচারিত হলো। রাক্ষসদের অত্যাচারে হতাশ মানুষের মনে সাহস দিলেন রামচন্দ্র। আরও বার্তা পাঠালেন যে, তিনি প্রজাদের ভয় দূর করতেই শুধু সক্ষম নন, দৃঢ়প্রতিজ্ঞও বটে।

সীতাকে বিবাহ করে অযোধ্যায় ফেরার পথে পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়কারী ভীষণ পরশুরাম ক্রুদ্ধ হয়ে সকলের পথ রুদ্ধ করে দাঁড়ালেন। এই সময় বশিষ্ঠ বা দশরথ কেউই পরশুরামের সঙ্গে কথা বলার জন্য এগিয়ে আসেননি। শ্রীরাম অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সামাল দেন। তিনি অত্যন্ত শান্তচিত্তে পরশুরামকে বুঝিয়ে দিলেন যে, সমাজ রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষত্রিয়দের বধ করে পরশুরাম দেশকে শ্মশানে পরিণত করেছেন। সারাদেশ বিদেশী রাক্ষসদের অত্যাচারে জর্জরিত। জনতাকে এমন মৃতপ্রায় করার সকল দায় তাঁর। পরশুরাম নিরুত্তর রইলেন। তারপর নিজের ভুল স্বীকার করলেন। এই পাপের জন্য তাঁর তেজোহরণ করা হলো। তাঁর স্বর্গে যাওয়ার পথ অবরুদ্ধ হলো। অর্থাৎ তাঁর কোনো প্রতিষ্ঠা-গৌরব আর রইল না। তাঁর প্রভাব শেষ হলো। এইভাবে পরশুরামের মতো মহাবীরকে নিজের সামনে নত করার জন্য শ্রীরামের প্রতিষ্ঠা ও গৌরব জনচিত্তে বহুগুণ বর্ধিত হলো। রাম ও পরশুরামের এই সাক্ষাতের অন্য একটি ফল দেখা দিয়েছিল। সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা স্পষ্ট বুঝেছিলেন— ক্ষাত্রবৃত্তির পরিপোষণ প্রয়োজন। সমাজের রক্ষণাবেক্ষণে অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয়ের প্রয়োজন আছে। সেইসঙ্গে ক্ষত্রিয়দের প্রচণ্ড স্বভাবের নিয়ন্ত্রণও প্রয়োজন। শ্রীরামচন্দ্রের এই মতবাদ সমাজে দ্রুত প্রসার লাভ করলো।

ক্ষত্রিয়ের অভাবে বিদেশী আক্রমণে দেশের লোকের দুর্দশার অন্ত যে থাকে না, তাই নয়, শিল্প, কলা, সংস্কৃতি নষ্ট হয়ে সমগ্র সমাজ দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে সমাজ রক্ষার উচ্চ আদর্শে স্বদেশ রক্ষায় মৃত্যুভয়হীন ও মোহহীন চিত্তের ক্ষত্রিয়দের সমাজে বিশেষ প্রয়োজন। এই কথা দেশের সর্বত্র স্বীকৃত হলো। পরশুরামের তেজোহরণের অর্থ এই-ই।

পরশুরামের দর্প হরণের মধ্য দিয়ে শ্রীরামের কর্মকাণ্ড শুরু হলো। কৈকেয়ীর জন্য রাম বনবাসী হলেন সত্য, কিন্তু তাঁর এই বনবাসে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র কেউ আপত্তি করলেন না। কারণ তাঁরা জানতেন বনবাসে গিয়ে রামচন্দ্র রাবণকে বধ করে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা রক্ষা করবেন। রামায়ণে ভরদ্বাজ মুনির কথায় এর আভাস পাওয়া যায়। রামকে ফিরিয়ে আনার জন্য ভরদ্বাজের আশ্রমে ভরত অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করলে ভরদ্বাজ ভরতকে বললেন, 'ভরত তুমি এমনভাবে মাতৃনিন্দা করো না। রামের এই বনবাসে লোকের মঙ্গল হবে।' এ থেকে বোঝা যায় রাবণ বধের পরিকল্পনা মুনি-ঋষিরা অনেক আগেই করেছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন, রাম রাজা হওয়ার আগেই রাবণবধ সম্পূর্ণ করে নিন। কৈকেয়ীকে দশরথের দেওয়া বর অনুসারে ভরতের তো সিংহাসনে বসার অধিকার ছিলই। এই অধিকার নস্যাৎ করে সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী শ্রীরামের রাজা হওয়ার আগে অলৌকিক পুণ্য কাজের অবদান রাখা প্রয়োজন। এই অনিবার্য প্রয়োজন সফল করার জন্য কোশলপক্ষীয় রাজনীতিবিদরা বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র-ভরদ্বাজদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। কারণ রাবণকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে জনসাধারণকে নিরাপত্তা-সুখ-শান্তি যে রাজা দিতে পারবে জনসাধারণ সেই রাজাকেই ভালবাসবে।

শ্রীরাম চৌদ্দ বৎসর বনবাসে ছিলেন। এই সুদীর্ঘকাল ধরে তিনি রাবণবধের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। অসামান্য নেতৃত্বগুণে জনসাধারণের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও প্রতিকার সামর্থ্য গড়ে তোলেন। আপন ব্যক্তিত্বগুণে নতুন নতুন মিত্র ও অনুগামী লাভ করেন। বনের সকল ঋষি তাঁকে স্বাগত জানান। বহু রাক্ষস (খর-দূষণ-মারীচ) নিধন করে তিনি জনমানসে শ্রদ্ধার আসন গড়ে তোলেন। এমনকী তিনি বানরজাতির লোকেদের সঙ্গেও মিত্রতা গড়ে তোলেন। দীর্ঘকাল যাবৎ সমস্তরকম প্রস্তুতি নিয়ে তিনি লঙ্কা আক্রমণ করেন এবং শত্রুর রাজধানীতে প্রবেশ করে তাকে বধ করেন। রাবণবধের জন্য সীতাহরণ তো কেবল নিমিত্ত মাত্র ছিল। রামচন্দ্র কোনো লোভের বশবর্তী হয়ে লঙ্কা আক্রমণ করেননি। রাবণ কর্তৃক আক্রান্ত নিজ দেশ রক্ষায় এটি একটি প্রতি-আক্রমণ ছিল। রাবণ বিদেশী ছিলেন না; জন্মসূত্রে তিনি ভারতীয়। তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, বেদাধ্যয়ন করেছিলেন, বিদ্বান ও পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু স্বভাবে ছিলেন অতিভোগী ও পরদারাসক্ত। অর্থাৎ জন্মসূত্রে ভারতীয় হয়েও তাঁর বৃত্তি রাক্ষস স্বভাবের হয়ে গিয়েছিল। অনেক আগে তিনি লঙ্কায় যান। সেখানকার বিত্ত-বিভব অধিকার করে বাস করতে থাকেন। রাবণের ভারত আক্রমণের অর্থ রাক্ষস-সংস্কৃতির দ্বারা ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির পরাভবসাধন। রাবণ স্বয়ং এই আক্রমণের নেতৃত্ব দেন। বিভীষণ এই নীতির পক্ষপাতী ছিলেন না। তাই তিনি রামচন্দ্রকে সাহায্য করেন। রাক্ষস সংস্কৃতির সঙ্গে রাবণ এমন একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন যে রাক্ষসরা তাকে আপন লোক বলেই ভাবতো। সীতা অন্বেষণে গিয়ে হনুমান লঙ্কায় বলেছিলেন, রাবণ তো রাক্ষস সমাজে বিদেশী। তার ভোগলালসার জন্যেই রাক্ষসকুল ধ্বংস হবে। এ কথায় রাবণ সম্পর্কে লঙ্কাবাসীর সন্দেহ হয়। লঙ্কার ঘরে ঘরে একথা আলোচিত হতে থাকে। রাবণের সৈন্যদের মধ্যেও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। এই বিষয়টিই হনুমানের লঙ্কায় আগুন লাগানো।

শ্রীরামের চরিত্রের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর স্বদেশপ্রীতি। লঙ্কাজয়ের পর লক্ষ্মণ রামকে বলেন, অযোধ্যায় ফিরে না গিয়ে এই সুবর্ণময়ী লঙ্কায় আনন্দের সঙ্গে রাজত্ব করুন। তার উত্তরে রামের সেই বিখ্যাত উক্তি— 'অপি স্বর্ণময়ী লঙ্কা ন মে লক্ষ্মণ রোচতে। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।।' মানুষ কেবল সুখের জন্য জীবিত থাকে না; তাতে জীবনের সার্থকতা নেই। অযোধ্যার পরিস্থিতি জটিল হলেও যাঁদের আশা আকাঙ্ক্ষা শ্রীরামকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে; যাঁরা আকুল হয়ে তাঁর পথচেয়ে বসে আছেন, তাঁদের ছেড়ে তিনি অন্য কোথাও থাকতে পারবেন না। তাঁর তো কোনো বৈভবের লোভ নেই। তিনি যে কাজ করতে লঙ্কায় এসেছিলেন তা সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং তিনি অযোধ্যায় ফিরে যাবেন। তারপর বিজিত রাজ্যের ভার বিভীষণকে দিয়ে তিনি অযোধ্যায় ফিরে এলেন। এই কর্মের মধ্যেই ভারতীয় রাজনীতির সমুচ্চ আদর্শ আমরা দেখতে পাই। বাহ্যত স্বাভাবিক ভোগে থাকলেও অন্তরে নিরাসক্ত থেকে, প্রজাদের জন্য, সমাজের জন্য আপন জীবন উৎসর্গ করার অপূর্ব এক নিদর্শন শ্রীরামচন্দ্রের জীবন। প্রজার কল্যাণের জন্য নিজসুখ বিসর্জন দিয়ে শ্রীরাম অযোধ্যায় ফিরে আসেন। তাঁর এই লক্ষ্যকে পূর্ণতা দিতে তিনি সীতাদেবীকেও পরিত্যাগ করেন। কিছুদিন পরে শ্রীরামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। তিনি প্রকৃত অর্থে 'আসমুদ্র পর্বত একরাট' ছিলেন। তাঁর অশ্বমেধ যজ্ঞ এক মহত্ত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক

ঘটনা। সমাজের হিতকামনায় 'একরাট'-এর স্বীকৃতির জন্যই এই যজ্ঞ করা হয়। রাজ্য রক্ষায় স্থায়ী ব্যবস্থা করাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। অশ্বমেধ যজ্ঞের মধ্য দিয়ে ক্ষত্রিয়শক্তিকে ধর্মের নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যবস্থাই সেযুগের সমাজপতিরা করেছিলেন। এই বিধির মাধ্যমে এক প্রয়োজনীয় নতুন তত্ত্বও প্রকাশ করা হয়েছিল। তাহলো রাজার শক্তির উৎস প্রজার সহায়তা। এই শক্তি সমাজের শক্তি। সৈন্যবাহিনী কেবল নিজের শক্তিতে দিগ্বিজয় করতে পারে না। এর জন্য সমাজের সহযোগিতা প্রয়োজন। সমাজের সমস্ত লোক নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী সৈন্যবাহিনীর বিজয়লাভে সহায়ক হয়। বাহুবল কেবল বাহুতেই থাকে না; থাকে সমস্ত শরীরে। বাহু কেবল তা প্রকাশ করে মাত্র। কাজেই নিজ শক্তির জন্য দম্ভ প্রকাশ করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে কখনোই উচিত নয়। মুনিঋষিরা সমাজ হিতে নিঃস্বার্থভাবে সমাজনীতি গড়ে তুললেন, রাজা সেই অনুযায়ী দেশ-শাসন করতে লাগলেন— ভারতবর্ষে এই পরম্পরা শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় থেকেই চলে আসছে। আমাদের রাষ্ট্রীয় নীতির এই বৈশিষ্ট্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মনে হয়, এই সময় গৈরিক ধ্বজ তৈরি হয়েছিল। গৈরিক বস্ত্র ব্রহ্মবলের ও দণ্ড ক্ষাত্রবলের চিহ্ন। এই দুইয়ের সমন্বয়েই গৈরিক ধ্বজ। এই সমন্বয়ে সমাজকে ধারণ করেই জাতি পর্যাপ্ত প্রাধান্য পেতে পারে। শ্রীরামচন্দ্র এই সমন্বয়ের তত্ত্বটি তাঁর রাজ্যশাসনের মাধ্যমে চরিতার্থ করিয়েছিলেন। ফলে তাঁর রাজ্য আজও আদর্শ রাজ্যরূপে পরিগণিত হয়ে আসছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, ক্ষত্রিয় সংহারই পরশুরামের কাজ। কিন্তু অস্ত্রধারী ব্যক্তিকেই পরশুরাম ক্ষত্রিয় বলতেন না। তাঁর মতে যারা লোভ, লালসা ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় মোহগ্রস্ত হয়ে অবিশ্বাস ও চতুরতার আশ্রয় নিয়ে কেবল নিজ শক্তিসম্পদ বৃদ্ধির জন্য যুদ্ধ করবে, তারাই ক্ষত্রিয়। তাদের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান ছিল, আর সহস্রার্জুনের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ হলো যে সহস্রার্জুন জনতাকে রক্ষার দায়িত্ব নিজ হাতে নিয়ে বিজিত রাজ্যের লোকদের নিরস্ত্র করতেন। এইখানেই পরশুরামের আপত্তি ছিল। তাই পরশুরাম তার বিরুদ্ধেই প্রথম যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তবে ক্ষত্রিয়দের হত্যা করে তিনি অনুশোচনা করেছেন এবং সেই পাপস্খালনের জন্য চেষ্টা করেছেন। মহর্ষি কশ্যপের অনুরোধে পরশুরাম অস্ত্র ত্যাগ করেছিলেন। একদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় পরশুরাম ও শ্রীরাম পরস্পরের পরিপূরক। পরশুরাম যেখানে থেমেছিলেন, শ্রীরাম সেখান থেকে শুরু করেছিলেন। পরশুরাম জীবন প্রান্তে এসে মর্যাদা পালনের অনুভব করেছিলেন, কিন্তু তা জীবনে প্রয়োগ করে যেতে পারেননি; শ্রীরাম তা জীবনে প্রয়োগ করে গেলেন, সমাজ রক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিকাশে ধ্যেয় চিন্তা থেকে তিনি কখনো বিচ্যুত হননি। এই ধ্যেয় চিন্তা থেকেই তিনি ব্যক্তিধর্ম, সমাজধর্ম, হিংসা, অহিংসা, ক্ষত্রিয় সংহার, বশিষ্ঠ- বিশ্বামিত্রের সংঘর্ষ, রাক্ষস সংস্কৃতির ভীষণ আক্রমণ এই সব নানা সঙ্কটে সমাজ যখন ভীতসন্ত্রস্ত, ক্ষতিগ্রস্ত তখন শ্রীরাম শুধু সমন্বয়ের পথে এইসব সমস্যার সমাধান করেছিলেন। ভারতের জাতীয়জীবনে শান্তি, সুস্থিতি স্থাপনে এবং এক আদর্শ রাজ্যপদ্ধতি প্রবর্তনে শ্রীরামের অবদান অনস্বীকার্য।

এই রামরাজ্যে কিন্তু অযোধ্যাবাসী প্রজাদেরও অবদান ছিল। শ্রীরামের রাজত্বকালে জনসাধারণের তেজস্বিতা ও গৌরব সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছিল। শ্রীরাম নিজ নিষ্ঠাবলে এই তেজস্বী জনসাধারণের বশ্যতা লাভ করেছিলেন। শ্রীরামের সীতা পরিত্যাগের পশ্চাতে এই তেজস্বী জনসাধারণের গূঢ় সমর্থন ছিল। রামরাজ্য গড়ার জন্য এক বিশাল সংগঠন তিনি তৈরি করেছিলেন। সংগঠনকার্যে তাঁর পূর্বাচার্য ছিলেন কার্তবীর্যার্জুন ও পরশুরাম। এই দুই পূর্বসূরির পরস্পরবিরোধী পথের মধ্যে শ্রীরাম এক আশ্চর্য সমন্বয় সাধন করেছিলেন। রামচন্দ্র ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিকে পবিত্র সম্পদ জ্ঞানে রক্ষা করার জন্য সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। সেই সংগঠনের সাহায্যে ত্রিভুবনজয়ী রাবণকে নিহত করেন। কার্তবীর্যার্জুন স্বার্থপর ব্যক্তিনিষ্ঠ সংগঠন গড়ে তোলেন। আর পরশুরাম একেবারে নিঃস্বার্থ সংগঠন গড়ে তোলেন। কোনো সংগঠনই স্থায়ী হয়নি। কিন্তু শ্রীরাম যে সংগঠন গড়ে তোলেন তা এই পশুত্ব ও দেবত্বের সমন্বয়ে (কার্তবীর্যার্জুন এবং পরশুরাম) গড়ে উঠেছিল। বস্তুত মানুষ পশু ও দেবতার মিশ্রণে তৈরি। পশুত্বের অংশ কমিয়ে দেবত্বের অংশ বৃদ্ধি করার মধ্যেই মনুষ্যত্ব। এই ধৈর্যশীল প্রযত্ন পরশুরামের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু শ্রীরাম তা করতে পেরেছিলেন। এই সাফল্যের চাবিকাঠি ছিল তাঁর স্বদেশপ্রীতির মধ্যে নিহিত। শ্রীরামের সংগঠনের মূল আধার ছিল দেশপ্রেম। সম্পূর্ণ সমাজ এক পুরুষ, আমরা তার অবয়ব— এই ছিল সেই সংগঠনের মূল কথা। সেখানে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ ছিল না। সমাজজীবনে বিলীন হওয়াই ছিল প্রত্যেকের জীবনের সাফল্য। সংগঠনের জন্য ন্যায় ও স্থায়ী আদর্শের কথা তিনি ভেবেছিলেন। তাই সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগঠক হিসেবে তিনি নমস্য। ভারতের রাষ্ট্রজীবনকে তিনি পূর্ণতা দান করেছিলেন। জগতের সামনে আদর্শ পথ দেখিয়েছিলেন। তাই তিনি ভারতবাসীর নয়নমণি। ■

প্রশ্ন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্মশান হতে বাপ ফিরে এল।

তখন সাত বছরের ছেলেটি— গা খোলা, গলায় সোনার তাবিজ— একলা গলির উপরকার জানালার ধারে।

কী ভাবছে তা সে আপনি জানে না।

সকালের রৌদ্র সামনের বাড়ির নিমগাছটির আগডালে দেখা দিয়েছে ; কাঁচা-আম-ওয়ালা গলির মধ্যে এসে হাঁক দিয়ে দিয়ে ফিরে গেল।

বাবা এসে খোকাকে কোলে নিলে, খোকা জিজ্ঞাসা করলে, 'মা কোথায়?'

বাবা উপরের দিকে মাথা তুলে বললে, 'স্বর্গে।'

২.

সে রাতে শোকে শ্রান্ত বাপ, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ক্ষণে ক্ষণে গুমরে উঠছে।

দুয়ারে লণ্ঠনের মিটমিটে আলো, দেয়ালের গায়ে একজোড়া টিকটিকি।

সামনে খোলা ছাদ, কখন খোকা সেইখানে এসে দাঁড়াল।

চারিদিকে আলো-নেবানো বাড়িগুলো যেন দৈত্যপুরীর পাহারাওয়ালা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছে।

উলঙ্গ গায়ে খোকা আকাশের দিকে তাকিয়ে।

তার দিশাহারা মন কাকে জিজ্ঞাসা করছে, 'কোথায় স্বর্গের রাস্তা?'

আকাশে তার কোনো সাড়া নেই; কেবল তারায় তারায় বোবা অন্ধকারের চোখের জল।

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

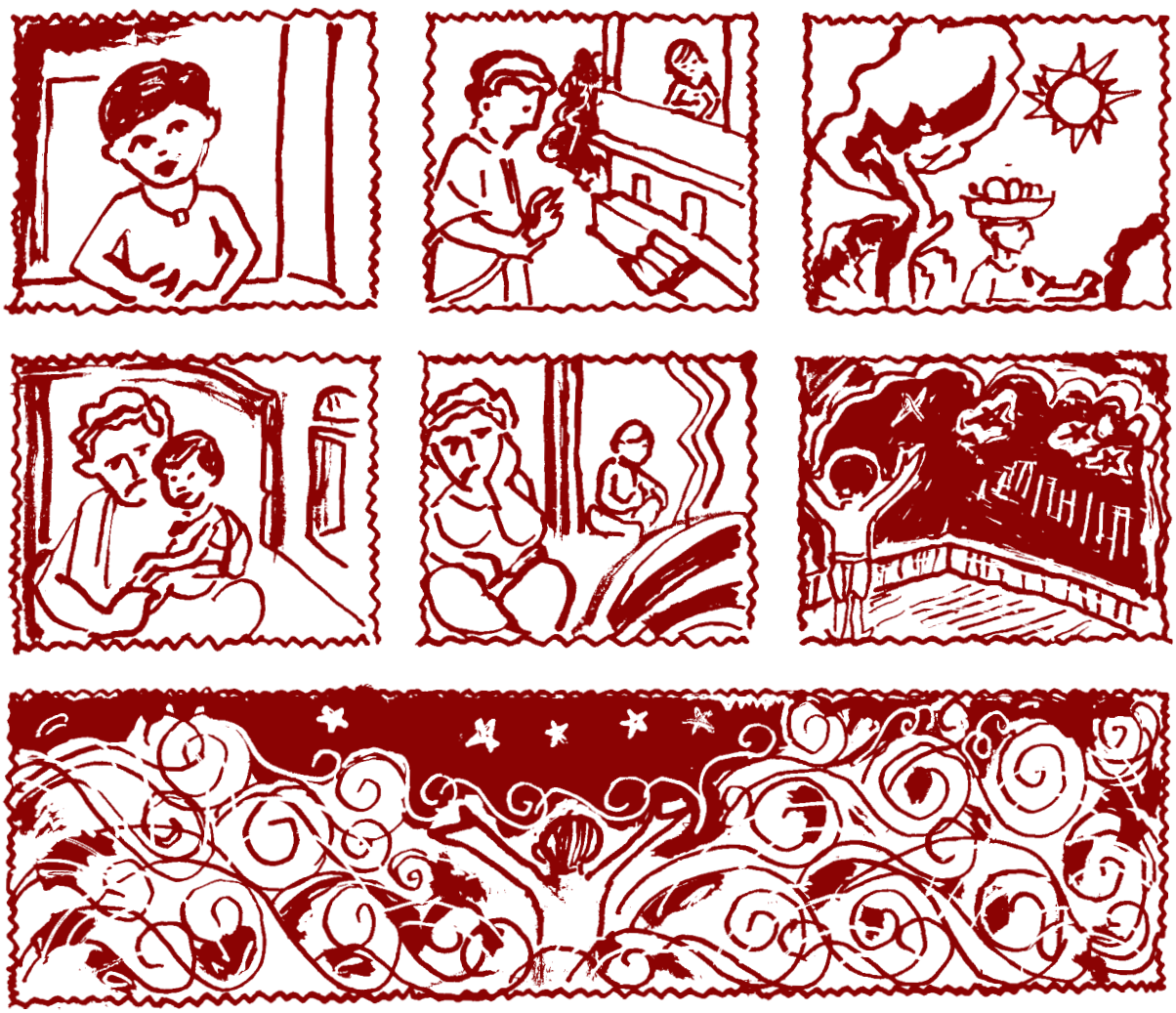

রঙ ভরো

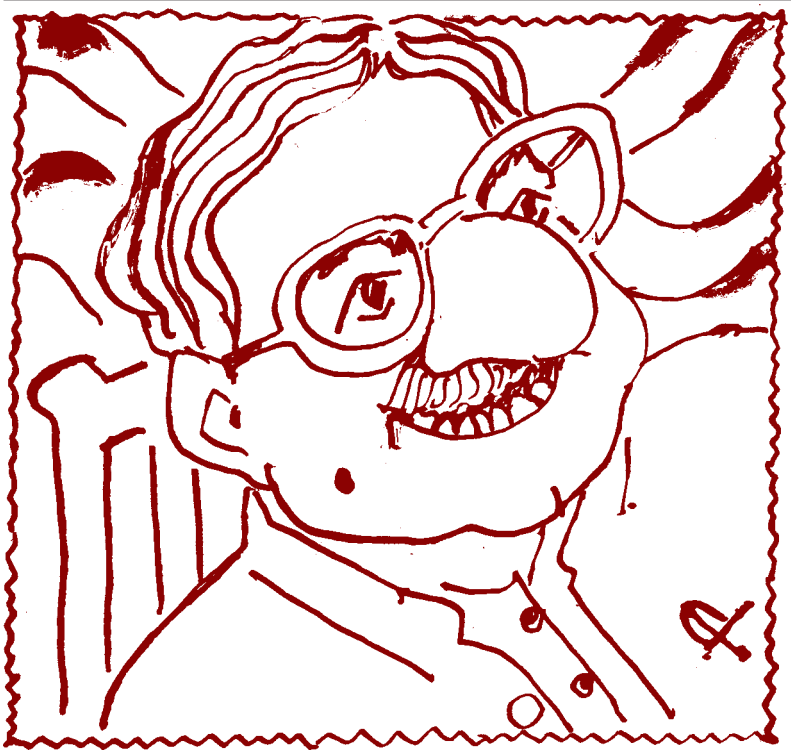

প্রশ্নবাণ

১. আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্ম ও মৃত্যু কবে?

২. তাঁর সত্তর বছর বয়সে কলকাতায় নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব কে করেন?

৩. প্রধানত কোন্ কোন্ কাজে তিনি সংকল্পবদ্ধ ছিলেন?

৪. 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' সংস্থায় কোন্ বিখ্যাত লেখক দায়িত্বপূর্ণ পদে ছিলেন? তাঁর ছদ্মনাম?

৫. কোন্ সালে প্রফুল্লচন্দ্র 'নাইটহুড' উপাধি পান?

উত্তর : ১. ২ আগস্ট ১৮৬১। ১৬ জুন ১৯৪৪। ২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩. অধ্যাপনা, স্বদেশ-ভাবনা, শিল্প-উদ্যোগ, গ্রন্থরচনা। ৪. রাজশেখর বসু। পরশুরাম। ৫. ১৯১৯ সালে।

ফিরে পড়া

উপদেশ

স্বর্ণকুমারী দেবী

(১৮৫৫-১৯৩২)

বড়লোক তুমি যদি হতে চাও ভাই,
ভালো ছেলে তাহা হলে আগে হওয়া চাই।
মন দিয়ে পড় লেখো, সুজন হইতে শেখো,
খেলায় সময় রেখো, তাতে ক্ষতি নাই।

পিতামাতা গুরুজনে দেবতুল্য জানি,
যতনে মানিয়া চল তাঁহাদের বাণী।
ভাইটি করেছে দ্বন্দ্ব বোনটি বলেছে মন্দ
ক্রোধে হয়ো নাকো অন্ধ, স্নেহে ধর পাণি।

প্রতিবাসী দাসদাসী আত্মীয়স্বজন,
ভালোবাসি সবে কহো সুমিষ্ট বচন।
দিওনা কাহারে দুখ অন্যে দান করি সুখ
নিজেরে মান গো সুখী, বালক সুজন।

জগতের সৃষ্টিকর্তা যিনি ভগবান
যাঁহা হতে পাইয়াছি সুখ-শান্তি-প্রাণ।
তাঁর পদে সঁপি মন তাঁরে স্মরি অনুক্ষণ,
মাগিয়া মঙ্গল, তাঁর কর নাম-গান।

লাভ জেহাদ এক গভীর ষড়যন্ত্র

সুতপা ভড়

'লাভ জেহাদ' শব্দটিকে ইদানীং প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে আমাদের সামনে পরিবেশন করছে। আজকাল আমরা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে 'লাভ জেহাদ'-এর নানান ঘটনা জানতে পারছি এবং এর পেছনে যে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে— তার আভাস পাচ্ছি। আমাদের সেকুলার নেতৃবৃন্দ, এক শ্রেণীর মিডিয়া এবং কিছু মুসলমান নেতা একে বয়সের ধর্ম, স্বাভাবিক প্রেম এইসব আখ্যা দিচ্ছেন, কিন্তু রাষ্ট্রের হিতাকাঙ্ক্ষীদের মতে এটি একটি অন্তর্রাষ্ট্রীয় চক্রান্ত— যার বলি হচ্ছে নিরীহ হিন্দু মেয়েরা। এই চক্রান্তটি বহুদিন ধরেই কার্যরত। কিন্তু পূর্ববর্তী সরকার ব্যাপারটিকে গভীরভাবে বিচার করতে দেয়নি এবং বলা যায় পরোক্ষ প্রশ্রয় দিয়েছে।

২০০৬ সালে এলাহাবাদের উচ্চ ন্যায়ালয়ের লক্ষ্ণৌ ডিভিসন বেঞ্চ তৎকালীন উত্তরপ্রদেশ সরকারকে প্রশ্ন করে— শুধুমাত্র হিন্দু মেয়েরাই কেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে? মুসলমান ছেলেরা কেন নয়? বহু ঘটনায় দেখা যায় ওইসব হিন্দু মেয়েকে প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে প্রথমে ধর্মান্তরকরণ, তারপর বিবাহ করে। অনেক ক্ষেত্রে ওইসব ধর্মান্তরিত মেয়েদের খোঁজ খবর পাওয়া যায় না। কেরলের বিভিন্ন প্রান্তে বহুসংখ্যায় হিন্দু মেয়েদের ধর্মান্তরিত করা হয়েছে, অথচ সংবাদমাধ্যমের দ্বারা আমরা এর সঠিক তথ্য কখনই পাই না।

অতি সম্প্রতি ঝাড়খণ্ডের রাঁচি থেকে রাষ্ট্রীয় শুটার স্বর্ণপদক বিজেতা তারা সহদেবের সঙ্গে যে ঘটনাটি ঘটে সেটি সর্বসমক্ষে আসে মিডিয়ার মাধ্যমে। তারা সহদেবের বক্তব্য রকিবুল হাসান প্রথমে রঞ্জিত কোহলি পরিচয় দিয়ে তাঁর সঙ্গে পরিচয়, তারপর প্রেম এবং শেষে বিবাহ করে। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে রাজি না হওয়ায় শারীরিক, মানসিক অত্যাচার করতে থাকে! তারা সহদেব কোনোরকমে চক্রব্যূহ থেকে বেরিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচান এবং পুলিশ, মিডিয়াকে অবহিত করেন। এরপর অনেক রহস্য আমাদের সামনে আসতে থাকে এবং মিডিয়ার সতর্কতার জন্য তারা সহদেবের মিথ্যা প্রেমকাহিনি সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গ, অসমে লাভ-জেহাদের শিকার হয়েছে প্রচুর হিন্দু মেয়ে। বিদেশ থেকে আর্থিক সহায়তাপুষ্ট একটি চক্র এই গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এরা নানানভাবে ফাঁদ পেতে হিন্দু মেয়েদের প্রথমে প্রেমের জালে ফাঁসায়, তারপর তাদের বাধ্য করে ধর্মান্তরিত করে বিবাহ করা জন্য। তারপর?... তারপর আমরা আর কিছু জানতে পারি না। অনেক ক্ষেত্রে ওই মেয়েদের পশ্চিমের তেলের দেশে পাচার করা হয় অথবা আরও অসহ্য অত্যাচার সহ্য করতে হয় ওইসব হতভাগিনীকে। কত হতভাগিনী সেই মিথ্যা ভালবাসার ফাঁদে পা দিয়ে অন্ধকার জগতে সারাজীবন কাটায় তার সঠিক হিসেবও পাওয়া যায় না। হতভাগিনীরা বুঝতেই পারে না এই লাভ অর্থাৎ প্রেম আমাদের সমাজকে আঘাত করার জন্য বিধর্মীদের একপ্রকার জেহাদ। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে 'কাবুলিওয়ার বউ' একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

সুতরাং, এখন সময় এসেছে কঠোর আইন প্রণয়নের— যার সাহায্যে এই ধরনের জঘন্য ঘটনা শীঘ্রই বন্ধ করা যায়। সর্বোপরি আমাদের মেয়েদের মধ্যেও যথেষ্ট সচেতনতা আনতে হবে। পরিবার, সমাজ, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়ে মাঝে মাঝে বিতর্কসভা, আলোচনা সভার মাধ্যমে সমাজ-জাগরণ করা জরুরি। ছাত্রাবস্থায় মেয়েরা কোমল থাকে। তারা যেন এইসব দুষ্টচক্রে না পড়ে তা দেখার এবং দুর্ভাগ্যবশত কোনো মেয়ে যদি এর শিকার হয়ে যায়, তখন তার সর্বপ্রকার সহায়তা করার দায়িত্ব আমাদের সবার। পরিবার, সমাজ, আইন, সরকার সবাই যখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদের মেয়েদের সচেতন করে শক্তিশালিনী হতে সহায়তা করবে, তখন লাভ-জেহাদের সাধ্য কি তাদের শিকার বানায়? সুতরাং, আমরা যেন কর্তব্যনিষ্ঠ হয়ে আমাদের মেয়েদের পাশে থাকি, তাদের রক্ষা করি, শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করি যাতে সব দুষ্টচক্র থেকে তারা বেরিয়ে আসতে পারে। তারাই শক্তিরূপিণী কন্যা, ভগিনী, মাতা। তাদের সর্বনাশ হলে ভারতের উন্নতি অসম্ভব।■

পরিবার বটে, তবে জনতা ছাড়া

অতিথি কলম

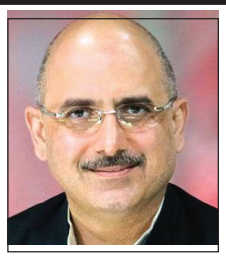

নলিন এস কোহলি

লালু, মুলায়ম, নীতিশ দৃশ্যত অঙ্গাঙ্গি হলেও আধুনিক ভারতের নির্বাচকমণ্ডলীর আশা আকাঙ্ক্ষার থেকে তারা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

সকলেই শুনেছেন সমাজবাদী কথাটিকে আগে অথবা পেছনে জুড়ে বা একটু ভিন্ন নামে দেশের ছ'ছটি রাজনৈতিক দল নীতিগতভাবে আবার 'একই সূত্রে বাঁধিয়াছি' ছ'টি প্রাণ মন্ত্র মাথায় রেখে মিশে যাওয়া মনস্থ করেছে। এরপর থেকে তারা একটি সম্মিলিত শক্তি হিসেবেই রাজনীতি করবে। মজার কথা, বাজারে তাদের এই মহামিলনের খবরের থেকেও তাদের নিজেদের মধ্যে সুপ্ত স্ববিরোধ ও ব্যক্তিগত স্বার্থের পরস্পর-বিরোধী অ্যাজেন্ডাগুলির ভবিষ্যতে মাথাচাড়া দেওয়া নিয়ে লোকে খুব খোশগল্প করছে। এখন এই কাণ্ডকারখানা বিজেপি-কে রুখতে বা সেই অর্থে মোদী আতঙ্কে হচ্ছে কিনা তা নিয়ে যেমন বিজেপি-র মাথাব্যথার কথা নয়, তেমনি কেউ বিভেদ ভুলে এক নৌকার যাত্রী হবে কিনা সে ব্যাপারেও তার কিছু বলার থাকতে পারে না। কিন্তু অতীতে এমন জোটের হঠাৎ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ার যে পরিসংখ্যান রয়েছে সেই সূত্রে কিছু মতামত দেওয়া খুব অপ্রাসঙ্গিক নয়। তাই এই 'জনতা পরিবার' কেন হঠাৎ মিলনাকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠল তা তাদের ঘোষিত সমাজবাদী ভাবধারায় চাগাড় দেওয়ার ফলে না অন্য কোনো অঘোষিত কারণ তা একটু অনুসন্ধান করা যেতেই পারে। বিশ্ব ইতিহাস উলটে-পালটে দেখলেই দেখা যায় একই শত্রুর বিরুদ্ধে নানান রাজা আলাদা আলাদাভাবে লড়াই লড়েছেন। অনেক সময়ই তারা কমন শত্রুর বিপক্ষে নিজেদের সংহত করতে পারেননি। অতীতের এই সব যুদ্ধবিগ্রহ মূলত হোত পররাজ্য জয় করে সীমানা বাড়ানোর তাগিদে। আবার শান্তিপূর্ণ পথে এই বিস্তার বহুক্ষেত্রেই হোত যুযুধান পরিবারগুলির মধ্যে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার কৌশলে। এক ধরনের অলিখিত জোটও এইভাবে গঠিত হয়ে যেত।

আজকের অতীত রাজ-ঘরানায় বিশ্বাসী পারিবারিক দলগুলি হঠাৎই সেইরকম চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই পারিবারিক দলগুলির অধিপতিদের পুত্র-কন্যাদের মধ্যে বিয়ে-থা হওয়ায় নিজেদের পারস্পরিক কট্টর অবস্থান হয়ত কিছুটা নরম হয়ে যেতে পারে। তবে লালুর আর জে ডি এবং মুলায়মের সমাজবাদী দলের ক্ষেত্রে তা ঘটলেও বাকিদের কিন্তু নিজের যে পরিচয়কে তারা কুমারীত্ব রক্ষার মতো আগলে রাখত তাকে সব শুদ্ধু বিসর্জন দিতে হবে। আলাদা পরিচয় বলে আর কিছু থাকবে না। শুধু তাই নয়, যে রাজনৈতিক মিলনের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট নীতিগত লক্ষ্য নেই সে ক্ষেত্রে স্ববিরোধিতায় ভরপুর এই বিষম মিলনের ভবিষ্যৎ মসৃণ কখনই নয়। রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণে বহু ক্ষেত্রেই 'হযবরল' জোট জন্ম নেয় কিন্তু তার দীর্ঘকালীনভাবে টিকে থাকার সম্ভাবনা ক্ষীণ। অতীত অভিজ্ঞতা বলে, ব্যক্তিগত পরিচিতি আর উচ্চাভিলাষ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিলিত পরিচয়কে তুড়ি মেরে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। যার চলতি নাম দাদাগিরি।

মনে রাখতে হবে, বিশেষ করে এই পরিবারকেন্দ্রিক দলগুলির ক্ষেত্রে যৌথ সিদ্ধান্তের থেকেও একনায়কতন্ত্রের ঝোঁক বরাবরই প্রবল। এই প্রবণতাকে অতীতের 'জনতা অবতার'গুলি কেউই ঠেকাতে পারেনি। অবশ্যই একতার রাজনীতি সকলেরই অভিপ্রেত হলেও শুধুমাত্র বাধা সৃষ্টি করার জন্য মিলন ভোটের ময়দানে আরও ভয়ঙ্করভাবে মার খেতে পারে।

বাস্তবে জনতা পরিবারের এই নব্য মিলন মডেলটি তুমুলভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী নবীন ভারতীয় ভোটার আদৌ পছন্দ করে না। তারা সুশাসন ও উন্নত জীবনযাত্রা পাওয়ার জন্য মরিয়া। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই দলগুলির অগ্রসরমান, দ্রুত পরিবর্তনশীল ভারতের মূলধারার রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সেই ফাঁপা চর্বিত-চর্বণের কচকচি তাদের নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার অক্ষমতাকেই প্রকট করে। মানুষ এখন উন্নয়ন হাতে নেড়ে দেখতে চায়। সুফল উপভোগ করতে চায়। কোনো বাণী, শূন্যগর্ভ স্তোকবাক্য তাদের না পসন্দ।

অন্যদিকে এইসব দলগুলির তাদের নিজেদের শাসিত রাজ্যে কাজ কর্মের, উন্নয়নের অধোগতির দিক থেকে নজর সরিয়ে দিতে দেশের সংসদকে বালখিল্যের রঙ্গভূমি বানানোর কৌশলও কাজে আসবে না। বিশেষকরে বিহার ও উত্তরপ্রদেশের কুশাসনের কথা না বলা অন্যায় হবে।

লক্ষণীয় জে ডি (ইউ) এবং লালুর আর জে ডি যত না তাদের উন্নয়মূলক কাজকর্মের জন্য আলোচনায় এসেছে তার ঢের বেশি আলোচিত হয়েছে নানানরকম বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়ে। বিহারে ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিতব্য বিধানসভা নির্বাচনের সময় সেখানকার ভোটাররা নিশ্চিতভাবে নীতিশের জনতা দল (ইউ) এবং লালুর আর জে ডি কীভাবে আর কী কদর্যভাষায় গত কয়েক দশক ধরে পরস্পরের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছে তা মাথায় রাখবে।

ভাববার বিষয় হচ্ছে, বিহারে এই যুগলমিলনের শাসন পরিচালনার মডেল কি হবে? সেটা কি লালুর ১৫ বছরের 'দুঃস্বপ্নের রাজ' অনুসরণ না কি বিজেপি'র সঙ্গে থাকা নীতিশের জোট সরকারের মডেলটি। নাকি একবারে সাম্প্রতিক দলিত জিতনরাম মাঝির নিত্যনতুন উন্মাদের প্রলাপ সম্বলিত শাসনপ্রণালীর অনুকরণ? ব্যাপারটা জটিল।

ভাগ্যের পরিহাসে মিলিত দল যদি নীতিশ কুমারের অরিজিনাল মডেলটি গ্রহণ

করে তাহলে আর বিজেপি-র শাসনের বিরুদ্ধে হুঙ্কার ছাড়ার কোনো সারবত্তাই তো থাকবে না। কেননা আদি মডেলটি বিজেপি ও জে ডি ইউ-এর যৌথ মডেল।

বিরাট বাজি ধরার বিষয় হয়ে দাঁড়াবে যদি দল ক্ষমতায় আসে। কে মুখ্যমন্ত্রী হবেন— নীতিশকুমার, শরদ, লালু (যদি মামলায় জেতেন) নাকি চলতি জিতন মাঝি? অন্যদিকে ২০১৭ সালের নির্বাচনে আজকের বিদেশ থেকে পড়াশোনা করে আসা এক তরুণ মুখ্যমন্ত্রীকে উত্তরপ্রদেশের ভোটারদের জবাবদিহি করতে হবে যে, কেন তাঁর দেওয়া আশ্বাস, প্রতিশ্রুতিগুলি ও কৃতকর্মের মধ্যে দুস্তর ফারাক রয়ে গেল। কেনই বা মেয়েদের নিরাপত্তার প্রশ্নে অমন কুৎসিত উক্তি করা হলো। কেনই বা কুখ্যাত অপরাধীদের ধরার চেষ্টা না করে পুলিশ এক প্রবীণ কুবাক্যে ওস্তাদ মন্ত্রীর মোষ খুঁজতে জান লড়িয়ে দিল। রাজ্যে রাজ্যে এই হরেক কিসিমের দুঃশাসনের ছায়া অবশ্যই প্রস্তাবিত মিলিত দলটির ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলবে। এই চাক্ষুষ বৈপরীত্যগুলিকে এড়িয়ে গেলে হবে না— এগুলির জবাব প্রয়োজন।

প্রসঙ্গত, আজকের বিহার ও উত্তরপ্রদেশ উভয় রাজ্যেই বিজেপি-কে পরিবর্তন, একই সঙ্গে সুশাসনের সমার্থক একটি দল বলেই জনতা ভাবছে। অন্যদিকে, জনতা পরিবারের অস্তিত্ব বাঁচাবার তাগিদ ছাড়া ভবিষ্যতের কোনো কর্মপন্থা নেই। বিজেপি বিরোধিতা বা অন্ধ মোদী বিরোধিতা কখনই একই সঙ্গে রাজনৈতিক ও আদর্শগতভাবে দায়বদ্ধ ও সুশাসনের অনুসারি কোনো পন্থার বিকল্প হতে পারে না। এই বিষয়টি কিন্তু জোটবদ্ধ হতে তৎপর দলগুলি ধর্তব্যের মধ্যেই আনছে না।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ তথাকথিত ইন্ডিয়া ও ভারত উভয়েই যারা কিছু করে দেখাতে পারবে না, পারবে না জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে এমন রাজনৈতিক দলকে সপাটে পরিত্যাগ করছে। এই প্রবণতা যেহেতু আগামী দিনেও বজায় থাকার সমূহ সম্ভাবনা তাই কারা হাত ধরাধরি করল বা নতুন খোলস ধারণ করল তা তাদের কাছে অকিঞ্চিৎকর। দেশে আজ সেই পুরনো প্রবাদও বদলে যাওয়ার মুখে। বোতলে এখন মদ থাকাই আবশ্যিক শর্ত, এখানে বোতলের কি পরিবর্তন হলো না একই রইল সে প্রশ্ন নিরর্থক ও পরিত্যাজ্য। এই হুঁশিয়ারিটি আজকের ভারতের আসল জনতার। রাজনীতিবিদরা যতই তাকে অবহেলা করবেন ততই তাঁদের বিপদ বাড়বে। তাই এই জনতা ছাড়া আশু মিলনে পড়ে থাকবে শুধুই 'পরিবার'।

(লেখক বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র)

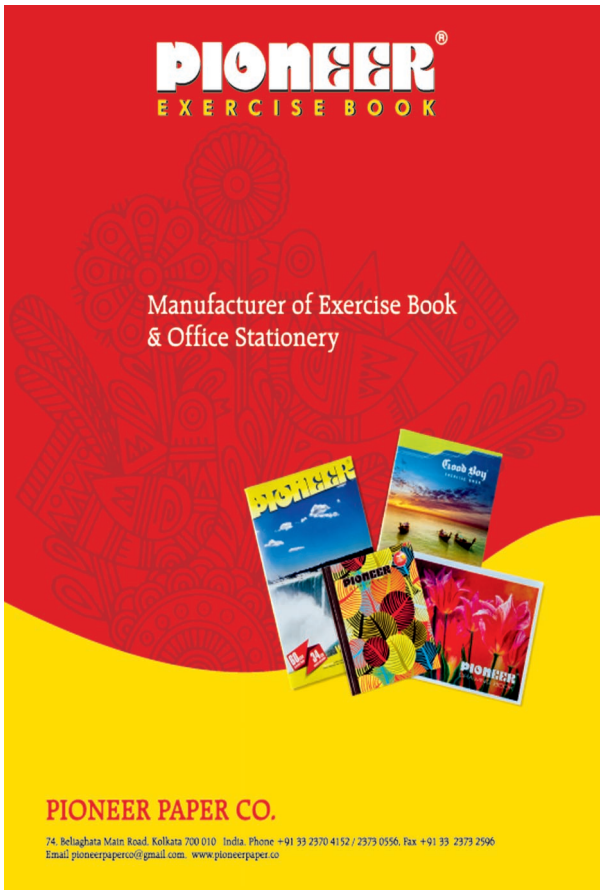

নেত্রদান মহাদান

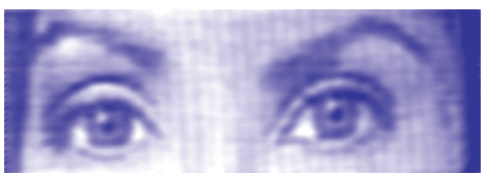

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল

দেবাংশু ঘোড়ই

দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর ভারতীয় জনতা পার্টি আদায় করে নিয়েছিল ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে মিটিং করার অনুমতি। তাও আবার যেখান সেখান থেকে নয়, খোদ মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি দেবাংশু বসাকের বেঞ্চ থেকে। ৩০ নভেম্বরের মিটিংকে ঘিরে বিজেপি-র একটা আলাদা সেন্টিমেন্ট কাজ করে এসেছে বহুদিন ধরেই। এবারের রাজ্যের শাসকদলের বিভিন্ন দপ্তর বাধা দিলেও তা যে আদতে ধোপে টেকেনি তা পরিষ্কার হয়ে গেছে এই মামলার রায় থেকেই। বিরোধীদলের শীর্ষ নেতা-নেত্রীরা সভার পর যাই বলুন না কেন অমিত শাহ যে এলেন-দেখলেন, পশ্চিমবঙ্গবাসীর মন জয় করলেন তা বেশ পরিষ্কার মাত্র দেড় দিনের আয়োজনে ভিড় দেখে। তবে সমালোচকদের যা কাজ তা তাঁরা করে গেছেন এবং তা নিয়ে কারোর কিছু বলার নেই, বলা সমীচীনও নয়। কিন্তু বিগত কয়েক মাস ধরে প্রত্যেক রাজ্যে অমিত শাহের উপস্থিতি এবং পরপর বিধানসভাগুলির জয়লাভ যে আচ্ছা আচ্ছা রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের হিসাব উলোট-পালোট করে দিয়েছে সেই নিয়ে কোনোও সংশয় নেই এবং আগামীদিনে যে আরও হবে তা আলাদা করে বলে দেবারও অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু মুশকিলটা হলো অন্য জায়গায়। যে কোনো রাজনৈতিক সভা সভার মতো হবে, এপক্ষ ওপক্ষ দুপক্ষ-ই ভিন্নমত পোষণ করবেন তা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তা বলে দিনদিন যেভাবে রাজনৈতিক ভাষার একটা পরিবর্তন ঘটে চলেছে তা যে রাজ্যের আশু দিনগুলোর জন্য খারাপ বার্তা নিয়ে আসবে তা বেশ স্বচ্ছ রাজ্যের শাসকদলের কুশীলবদের বিভিন্ন কথাবার্তায়। আগামী দিনগুলোতে পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসেবে অন্যদের পরিচয় দিতে প্রত্যেকটি আপামর জনসাধারণের যে লজ্জায় মাথা নত হবে তা নিয়েও মনে কোনোরূপ সংশয় নেই। দু'দিনের ছেলে যার

এখনও রাজনৈতিক দুধের দাঁত ঠিকমতো গজায়নি, মুখে আধো-আধো বুলি এখনও তার মস্তিষ্কের (বুদ্ধির) কথা তো ছেড়েই দিলাম, আছে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ। আর যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নিই যে আছে তা যে কতটা উপযোগী এই রাজনৈতিক কারবারে তা নিয়ে বেশ সন্দেহ আছে। অন্তত আর কিছু না হোক তাঁর বক্তৃতা শুনে তো তাই মনে হয়। এখনও বুঝলেন না কার কথা বলছি। আরে ভাইপোর কথা... আমার-আপনার নয়, স্বয়ং রাজেশ্বরী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপো শ্রীমান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। ৩০ নভেম্বরে, ২০১৪ রবিবার রাজ্য বিজেপি-র সভা খুব সুন্দরভাবে এবং রাজ্য প্রশাসনকে কোনোরকম বিড়ম্বনায় না ফেলে সুসংহতভাবে হয়ে যাবার পর ১ ডিসেম্বর, ২০১৪ সোমবার ঠিক তার পরের দিনই শহিদ মিনার ময়দানের মঞ্চে যুব তৃণমূল সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে যে ভাষায় বিজেপি-র জাতীয় সভাপতিকে আক্রমণ করলেন তা যে এক কথায় তাঁর রাজনৈতিক অদূরর্শিতারই পরিচয় রাখে তা আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর কটাক্ষ ছিল ঠিক এরূপ— 'নেংটি ইঁদুরের সঙ্গে নাকি রয়াল বেঙ্গল টাইগার মাঠে নামবে ইত্যাদি, ইত্যাদি...', শুধু অভিষেকই নন দলের প্রবীণ নেতা এবং পোড়খাওয়া রাজনীতিক মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ও অমিত শাহকে উদ্দেশ্য করে বলেন 'মোদীর চামচা শেয়াল' এবং আরও অনেক কিছু। আমার একটাই জিজ্ঞাসা এঁদের কাছে— কি জানেন আপনারা অমিত শাহের সম্বন্ধে? কতটুকু চেনেন তাঁকে? ভারতীয় জনতা পার্টির মতো একটা সর্বভারতীয় পার্টির সবচেয়ে কনিষ্ঠ জাতীয় সভাপতির মতো একটা পদে আসীন এরূপ এক ব্যক্তিকে কি অবলীলায় আপনারা যা মুখে এসেছে বলে গেছেন। একবার ভাবেনওনি কি বলছেন। আপনারাই তো সবসময় মুখে মুখে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-সংস্কৃতি নিয়ে কপচান কিন্তু সেই দিনের সভায় যা যা ভাষা ব্যবহার করলেন তাতে কি আমাদের রাজ্যের শিল্প-সংস্কৃতির মান বাড়ল? নিজেদের জিজ্ঞেস করুন একবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। অবশ্য এইসব করার পর সময় পেলে তবে তো দেখবেন। আমার বোধহয় না, অবশ্য আপনাদের তাতে কিছুই যায় আসে না, কারণ আপনারা এইসব বলে বলেই অভ্যস্ত, এই ধরনের স্কুলেরই ছাত্র আপনারা। কারণ হেডদিদিমণি সমেত সমস্ত টিচার্স রুমটাই এই শিক্ষায় শিক্ষিত, ভালোওবাসেন এইসব শুনতে, মনটাও ভরে যায় হোমটাস্কগুলো দেখে ও শুনে। কারণ যতটা না শিক্ষা দিতে ও নিতে প্রস্তুত তার চেয়ে ঢের বেশি প্রস্তুত স্কুলের বাচ্চাদের মতো মিড ডে মিলের ঘণ্টায় খেতে, তাই যে যা পাচ্ছেন প্রথমদিন থেকে শুধু খেতেই ব্যস্ত। আদৌ তা হজম হবে না হবে না, সে

নিয়ে কোনো মাথাব্যথা, চিন্তাভাবনা নেই। খালি গণ্ডেপিণ্ডে খেতে পেলেই হলো।

যান একটু খোঁজ করে দেখুন অমিত শাহের অতীতটা। কোনো দিনই তিনি প্রথম থেকে জনসঙ্ঘ বা বিজেপি-র সদস্য ছিলেন না। প্রবীণ আর এস এস কার্যকর্তা গুজরাতের রতিভাই প্যাটেলের স্মৃতিচারণে— ''৮০-র দশকে অমিতভাই ছিলেন আর এস এস-র একজন একনিষ্ঠ স্বয়ংসেবক-কার্যকর্তা। অনেকেই তাঁকে আমেদাবাদের ফাঁকা দেওয়ালে পোস্টার মারতে দেখেছেন।'' অভিষেকবাবুকে জিজ্ঞাসা করি কতবার উনি গেছেন এধরনের কাজে বা তাঁরই দলে এধরনের কাজ যাঁরা করে বেড়ান তাঁদের সাহায্য করতে? কই হাতে গুনে বলুন দেখি... ছেড়ে দিন মানে হাতেগোনা ছেড়ে দিন, অন্তত মনে করে দেখুনতো একবার, মনেও পড়বে না, কারণ কখনও করেননিও, মনে পড়বে কেমন করে। তাই বিনা পয়সায় একটা উপদেশ দিচ্ছি পারলে মাথায় রাখবেন। শ্রদ্ধেয় আদরণীয়া পিসিমা সাংসদ পদটা গিফট্ করেছেন সেটা নিয়েই আনন্দে থাকুন, কেমন। এখানেই শেষ নয়, আরেকটু খবর নিয়ে দেখুন উনি পেশায় একজন নিউরোলজিস্ট আর এখানে অন্তত আমায় আলাদা করে বলে দিতে হবে না একজন নিউরোলজিস্ট হতে গেলে একজন মানুষের কতটা ব্যুৎপত্তির দরকার পড়ে আর আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি না নিউ দিল্লীর আই আই পি এম অর্থাৎ ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব প্ল্যানিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট থেকে বিবিএ এবং এমবিএ ডিগ্রি। তাও যদি কোনো আই আই এম থেকে হোত তাহলে তো মশাই আপনার সঙ্গে কোনো কথা বলাই যেত না। নিঃসন্দেহে ভালো ডিগ্রি এনিয়ে কোনো সন্দেহও নেই, কথাও বলব না কিন্তু চুপি চুপি বলে রাখি পাছে কেউ শুনতে পায়, আপনিও জানেন আর আমার মতো অনেকেই জানেন যে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ডিগ্রি নিতে মেধার থেকে বেশি পকেটের জোর দরকার হয়, তাই খুব স্বাভাবিক আপনার ট্যাঁকের জোর ছিল আপনি কিনেছেন, এ আর নতুন কি কথা! তার মানেই যে আপনি অমিতভাইয়ের সমগোত্রীয় হয়ে গেলেন এরকম ভুল ধারণায় থাকবেন না। আর তাছাড়া যেটা এখনও বলিনি সেটা হলো অমিতভাইয়ের সাংগঠনিক ক্ষমতা সম্বন্ধে। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনেও হয় না এখানে আলাদা করে আর কিছু বলার রয়েছে। সেটা তো সারা ভারতবাসী প্রতি মুহূর্তে তিল তিল করে টের পেয়েই চলেছেন, আমি আর আলাদা করে কিই বা বলব। বরং বলাটা বাতুলতা ছাড়া আর অন্য কিছু হবে না। গত ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশের মতো জায়গায় ৮০টি আসনের মধ্যে এবার বিজেপি ৭১টি আসন পেয়েছে এবং সঙ্গী আপনজন পার্টিকে ২টি আসন পেতে সাহায্য করেছে। তারপর ধীরে ধীরে মহারাষ্ট্রে, হরিয়ানা। আগামী দিনগুলোতে হয়তো জম্মু ও কাশ্মীর, ঝাড়খণ্ডে এবং এ রাজ্যও তাঁরই কৃতিত্বে বিজেপি-র পকেটস্থ হবে। শুধু তাই নয়, তাঁর জন্য স্বয়ং দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁকে 'ম্যান অব্ দ্য ম্যাচ' উপাধিতে ভূষিতও করেছেন।

আছে আপনার এই সাংগঠনিক ক্ষমতা? আপনি তাঁর নখেরও যোগ্য নন, আর সেই আপনিই কিনা তাঁর সমালোচনা করছেন মঞ্চে দাঁড়িয়ে। কি অবস্থা ভাবতেও অবাক লাগে, আপনি তো বটেই আপনার সঙ্গে সঙ্গে প্রবীণ নেতৃস্থানীয়রাও। আসলে আপনাদের কি অবস্থা জানেন তো 'গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল'।

(লেখক কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী)

এজেন্টদের জন্য

অন্তত পাঁচ কপির কম স্বস্তিকার এজেন্সী দেওয়া হয় না। প্রতি কপি স্বস্তিকার জন্য ২০.০০ টাকা করে অগ্রিম জমা অবশ্যই রাখতে হবে।

প্রতি মাসের বিলের পাওনা টাকা অবশ্যই পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা প্রয়োজন। অন্যথায় এজেন্সী বাতিল হতে পারে।

স্বস্তিকা ডাক, রেল ও সড়ক পরিবহন দ্বারা পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। ২৫ কপির কম পত্রিকা রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পাঠানো হবে না। রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পত্রিকা নিতে ইচ্ছুক এজেন্টকে নিকটবর্তী রেল স্টেশনের নাম বা পরিবহন সংস্থার নাম, ঠিকানা (পিন সহ) এবং ফোন নম্বর (যদি থাকে) জানাতে হবে।

নতুন এজেন্ট হলে অগ্রিম জমা টাকা সমেত সম্পূর্ণ নাম ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার।

আরও বিস্তারিত জানতে স্বস্তিকা দপ্তরে পত্রালাপ করুন। মুদ্রিত অফিসের মোবাইলে ফোন করতে পারেন। — ব্যবস্থাপক

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের

ভাজা সামুই ব্যবহার করুন

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,

মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সন্ত্রাসবাদ ও অনুপ্রবেশ প্রশ্নে উদ্বিগ্ন অসম, পূর্বোত্তর

দিলীপ চট্টোপাধ্যায়॥ 'বঙাল খেদা' কথাটা গত শতাব্দীর অষ্টম দশকে প্রথম এসে আছড়ে পড়েছিল পশ্চিমবঙ্গবাসী মাছ-ভাত খাওয়া বাঙালির অন্দরমহলে। পূর্বদিকে অসম থেকে পাহাড় জঙ্গল ডিঙিয়ে, তৎকালীন জ্যোতি বসুর আমলে পশ্চিমবঙ্গে এই সমতলে আসতে আসতে 'বঙাল খেদা' আন্দোলন, তার সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল জরুরি আরও কিছু খবরাখবর। তার মধ্যে অন্যতম হলো বাঙালি অনুপ্রবেশকারী (বাংলাদেশ থেকে) বা অ-অসমিয়াদের অসমের মাটি ছাড়তে হবে। যত তাড়াতাড়ি এই বহিরাগতরা মায়া কাটিয়ে পাততাড়ি গোটাতে পারে ততই তাদের পক্ষে মঙ্গল। নইলে লুটতরাজ খুন-জখম, অগ্নিসংযোগের দাওয়াই তো রয়েছেই। চাই কি 'নেলি ম্যাসাকারের' মতো ঘটনা শিক্ষা দেবার জন্য আরও ঘটতে পারে। অসমের ভূমিপুত্রদের আন্দোলন তখন একেবারে তুঙ্গে। অসম আন্দোলনের এই তুঙ্গ মুহূর্তেই বাংলাদেশ থেকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলো অনুপ্রবেশের প্রশ্নটি একেবারে সামনে চলে আসে। এরপর অবশ্য অসম আন্দোলনকারীদের সঙ্গে চুক্তি হয়। সংঘর্ষ বন্ধ হয়। কিন্তু ১৯৭১-কে ভিত্তিবর্ষ ধরে বাড়তি জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান করার বিষয়টির আজ পর্যন্ত নিষ্পত্তি হয়নি। তাই ক্ষোভ রয়েছে একেবারে গাঁ ঘরের সাধারণ অসমিয়া মানুষজন থেকে শুরু করে শহরে ছাত্র— যুবকদের মধ্যেও। সেদিনকার তরুণ তুর্কিরা আজ যতই ক্ষমতার আলিন্দে পায়চারি করতে করতে বিদ্রোহের কথাবার্তা বলা বন্ধ করে দিক অনুপ্রবেশের সমস্যাটা আজও আছে। ব্রহ্মপুত্রের জল যেমন শুকিয়ে যায়নি ঠিক তেমনই অসমে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ নিয়ে ক্ষোভের আগুনও জ্বলছে ধিকিধিকি। তারই উদাহরণ আমরা দেখেছি ধুবড়ি, গোয়ালপাড়া, কোকরাঝাড়ের মতো নামনি অসমের জেলাগুলিতে।

সম্প্রতি ধুবড়ি, গোয়ালপাড়া, নলবাড়ি প্রভৃতি এলাকা দিয়ে আবার ব্যাপক হারে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ তাই চিন্তায় ফেলেছে প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের। একেইতো পরেশ বড়ুয়া গোষ্ঠীর আলফা বা বোড়ো জঙ্গিদের বন্দুক এখনও হাত থেকে নামেনি।

অপারেশন রাইনো থেকে সামরিক পুলিশ বাহিনীর অভিযানে জনগণ তিতিবিরক্ত। তার ওপরে কামরূপ, ধুবড়ি, গোয়ালাপাড়া নলবাড়ির মতো সীমানা সংলগ্ন জেলাগুলো দিয়ে অনুপ্রবেশ। প্রশাসনের আশঙ্কা যে কোনো দিনও হয়ত এই ব্যাপারটি থেকেই আবার বঙাল খেদার মতো কোনো আন্দোলন শুরু হয়ে যাবে। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের কর্তাব্যক্তিরা স্বীকার করছেন যে, বিশাল এই বাংলাদেশ সংলগ্ন সীমান্ত সীমান্ত অসম রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় নজরদারি চালাবার মতো উপযুক্ত কর্মী ও যানবাহনের অভাবেই অনুপ্রবেশের সমস্যাটিকে বাগে আনা যাচ্ছে না। ব্রহ্মপুত্র নদের বিরাট জল সীমানাতেও অনুপ্রবেশকারীরা ভর্তি। স্মাগলার ও অনুপ্রবেশকারীরা সীমান্তরক্ষীদের তাড়া খেলেই এই এলাকায় ব-দ্বীপগুলোতে লুকিয়ে পড়ে। সেখান থেকে তাঁদের খুঁজে বের করাই কঠিন। অনেকে আবার বি.এস.এফ-এর চোখ এড়িয়ে ঢুকে পড়ে অসমের সীমানায় বিভিন্ন বাণিজ্য দলের সঙ্গে। পরে আর ফিরে যায় না।

বাংলাদেশের ভেতরে ভারতীয়দের যে চাষবাসের জমি রয়েছে সেখানে যখন এপার থেকে কষিজীবীরা চাষ করতে যায় তখন তাদের সঙ্গেও অনেক বাংলাদেশি টাকার বিনিময়ে এপারে চলে আসে। এই রকম বিভিন্ন উপায়ে প্রতিনিয়ত অনুপ্রবেশকারী মানুষের সংখ্যা বাড়ছেই। সাম্প্রতিক সময়ে অসমে হিংসা ও সন্ত্রাসের পিছনেও অনুপ্রবেশজনিত সমস্যাও যে অন্যতম কারণ সেকথা রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা এটাকে স্বীকারও করেন। অনুপ্রবেশ সমস্যা শুধু অসম নয়, সমস্ত উত্তর- পূর্বাঞ্চলকে অস্থির করেছে। এই সুযোগে চার্চ, মুসলিম মৌলবাদীদের কাজকর্ম সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। বড়ো জঙ্গিদের পিছনে ব্যাপটিষ্ট চার্চের মদতের অভিযোগও আছে। বড়ো অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে বিদেশি সাহায্যপুষ্ট কিছু এন.জি.ও-র কাজকর্ম সম্পর্কেও বিস্তর অভিযোগ রয়ে গেছে। কাজেই অসমে হিংসা, সন্ত্রাস থামাতে গেলে উস্কানিদাতা এই সব শক্তির বিরুদ্ধে কেন্দ্র ও অসমে সরকারকে অবশ্যই কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

চার্চ সংস্থাগুলি যে উত্তরপূর্বের বিচ্ছিন্নতার সবচেয়ে বড় মদতদাতা তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কেন্দ্রও ভালোভাবে জানে যে, উত্তরপূর্বের সন্ত্রাসবাদী হিংসার পীঠস্থান নাগাল্যান্ড। নাগাল্যান্ডের এন.এস.সি এম (আই এম) ও খাপলং গোষ্ঠী হলো সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসবাদী বিচ্ছিন্নতাবাদী সংস্থা। যাদের মদত আসছে মার্কিন প্রশাসন ও চার্চের মাধ্যমে। তবু উত্তরপূর্বে শান্তির আশায় পূর্বতন ইউপিএ সরকার সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে আলাপ- আলোচনার টেবিলে বসেছিল।

পর্যবেক্ষক মহল মনে করছেন যে, পূর্বতন সরকারের এই মনোভাব উত্তরপূর্বাঞ্চলে সন্ত্রাসবাদীদের উৎসাহিত করেছে। এর ফলেই অসমের সাম্প্রতিক সন্ত্রাস ও হিংসা পরিস্থিতি, তাতে পশ্চিমবঙ্গেও এর প্রভাব পড়তে পারে। অবশ্য একটা কথা অনস্বীকার্য যে উত্তরপূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমবঙ্গের অনুপ্রবেশজনিত সমস্যা সামাজিক অস্থিরতাকে বাড়াতে সাহায্য করছে। যে কোনো মূল্যে তাই বাংলাদেশ, নেপাল, ভূটান থেকে মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের হটাতে কেন্দ্রের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া উচিত।

রানী গাইদিনলিউকে ভারতরত্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মণিপুর দুহিতা বীরাঙ্গনা চিত্রাঙ্গদার কথা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন। ওই ভূমির আরেক বীররমণীর কথা রবীন্দ্রনাথের জানা ছিল না। চিত্রাঙ্গদা রাজেন্দ্রনন্দিনী। অন্যজনের জন্ম সাধারণ পরিবারে। তাঁর দেশপ্রেম চিত্রাঙ্গদার থেকে একটুও কম ছিল না। ইংরেজ শাসকদের কুশাসন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি অসীম সাহসের সঙ্গে লড়াই শুরু করেন ষোল বছর বয়সে। সারাজীবন ধরে চলেছে তাঁর সংগ্রাম। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাঁর কথা লেখা রয়েছে। তাঁর নাম : রানী গাইদিনলিউ। জন্ম : ২৬ জানুয়ারি ১৯১৫। মৃত্যু : ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩। স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনে নাগাভূমির এই কন্যার সক্রিয় ভূমিকা ইংরেজ শাসকদের পছন্দ হয়নি। তাঁকে ১৪ বছর কারাবাস করতে হয়েছে। সাধারণ মানুষের জন্যে সংগ্রামের জন্যেই পেয়েছেন রানীর শ্রদ্ধা মর্যাদা। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ি অঞ্চলে তাঁর পরিচিতি হয় রানীমা।

১৯৩৭ সালে যখন তিনি শিলং-এর কারাগারে রয়েছেন সেসময় তাঁর সঙ্গে দেখা করেন জওহরলাল নেহরু। ১৯৯৩ সালে তাঁকে পদ্মভূষণ সম্মান জানানো হয় প্রজাতন্ত্র দিবসে। দেহাবসানের কয়েকদিন আগে। নতুনভাবে রানী গাইদিনলিউ-এর অবদানকে স্মরণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগামী বছর তাঁর জন্মের শতবর্ষ উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা চলছে। প্রস্তাব রয়েছে তাঁকে মরণোত্তর ভারতরত্ন সম্মান জানানোর। যা দেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান। এজন্যে 'দ্য ন্যাশনাল কমিটি ফর বার্থ সেন্টেনারি সেলিব্রেশন অফ রানীমা গাইদিনলিউ'-এর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। নাগাভূমির মুখ্যমন্ত্রী টি আর জেলিয়াং ও মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী ও ইবোই সিং এই কমিটির পৃষ্ঠপোষক হয়েছেন।

রানী গাইদিনলিউকে ভারতরত্ন সম্মান জানাবার সঙ্গে প্রস্তাব রয়েছে ডিমাপুর বিমানবন্দরের নাম 'গাইদিনলিউ' রাখার। এছাড়া একটি উপযুক্ত জায়গা বেছে নিয়ে তাঁর নামে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তার রয়েছে। কোহিমাতে তাঁর নামে একটি সংগ্রহালয় স্থাপনের প্রস্তাবও আছে। সেইসঙ্গে বলা হয়েছে সংসদে তাঁর একটি তৈলচিত্র রাখার। রাজধানী ও অন্যান্য শহরে তাঁর মূর্তি স্থাপনেরও প্রস্তাবও আছে। রানী গাইদিনলিউর জন্ম একশো বছর আগে মণিপুরের নানকাও গ্রামে। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেন ১৩ বছর বয়সে। নাগাভূমি এলাকা ও মণিপুর অঞ্চলে বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ১৬ বছর বয়সে গ্রেপ্তার হন। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় তাঁর। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৭ সালে মুক্তি পান জেল থেকে। পূর্বাঞ্চলের স্বাধীনতা সংগ্রামে রানী গাইদিনলিউর ভূমিকা হিন্দু জাগরণের ক্ষেত্রে প্রভূত সহায়ক হয়ে উঠেছিল। স্বধর্ম প্রতিষ্ঠার সপক্ষে আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল সক্রিয় ও সার্থক। জীবনাবসানের পর দুই দশক পেরিয়েছে ঠিকই, কিন্তু এখনও ভারত ইতিহাসে তাঁর অবদানের কথা উজ্জ্বলভাবে লেখা। শতবর্ষের আলোতে তাঁকে নতুন করে স্মরণ করার উদ্যোগে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ।

অখিল ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনা সংস্থা ভারত ইতিহাসের পুনর্লিখনের পরিকল্পনা নিয়েছে। রানী গাইদিনলিউ'র ভূমিকা নিয়ে দুদিনের আলোচনা চক্র ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে গুয়াহাটিতে। ঘোষণা করা হয়েছে : 'সারা দেশজুড়ে রানীমা গাইদিনলিউর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।' একথা জানিয়েছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক ভাইয়াজী যোশী। জেল থেকে ১৯৪৭ সালে ছাড়া পাবার পর তিনি সক্রিয় ভূমিকা নেন উত্তরপূর্বাঞ্চলে পার্বত্য ভূমির জনস্বার্থে এবং নাগাভূমির জন্যে।

রাষ্ট্রীয় স্তরে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে জাতীয় সংগ্রামের ক্ষেত্রে অনেক বিস্মৃত অধ্যায় ও বিভিন্ন দেশপ্রেমীর অবদান ধরে রাখার। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন নানাজী দেশমুখ, দীনদয়াল উপাধ্যায়, শ্রীঅরবিন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, হেমু বিক্রমাদিত্য, মহর্ষি য়্যানকালি (Ayyankali), শ্রীনারায়ণগুরু, রাজেন্দ্র চোল, আসফাকুল্লা খান। এছাড়াও এই তালিকায় রয়েছেন আরও অনেক দেশপ্রেমী।

হাওয়ারে ফাউন্ডেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সব মানুষেরই স্বপ্ন থাকে নিজের একটি ছোট্ট বাড়ি থাকবে, নিজের মতো করে সাজিয়ে গুছিয়ে তুলবে। আবার এটা ভেবে কষ্ট হয়, যে মানুষটা ঘর বা বাড়ি তৈরিতে সিদ্ধহস্ত সে যখন তার পরিবারকে নিয়ে খোলা আকাশের নিচে বা ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে বসবাস করছে। আসলে শখ থাকলেও সামর্থ্য না থাকার দরুন সাধপূরণ করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। এসব ভাবনাতেই গরিব কয়েক'শ পরিবারের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন স্থাপত্য শিল্পী সতীশ হাওয়ারে।

গরিবদের জন্য আবাসন। (ইনসেটে সতীশ হাওয়ারে)

সতীশের ইচ্ছা ছিল মানুষের জন্য কিছু করার। তাই মুম্বই শহরে সতীশ তাঁর স্বপ্নকে সফল করতে লেগে পড়েন। সতীশ ফুটপাতে থাকা মানুষজনকে দেখে ভাবতো তাদের যদি একটা ঘর থাকত! অতঃপর নবি মুম্বইয়ের খাড়গড়ে তিনি একটি বহুতল আবাসন নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নেন। যেখানে শুধুমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর মানুষজনই থাকবে বলে তিনি ঠিক করেন। অবশেষে বহুতল নির্মাণ হয়। মাত্র আড়াই-তিন লক্ষ টাকায় এক একটি ফ্ল্যাট বিক্রির সিদ্ধান্ত হয়। সব্জি বিক্রেতা, রিক্সাওয়ালা বা ফুটপাতে বসা ফেরিওয়ালারা যাতে সহজেই সেই আবাসনের মালিক হতে পারেন তার জন্য হাওয়ারে বিল্ডার্স-এর পক্ষ থেকে ঋণ পাওয়ারও বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়। বর্তমানে ২০০ পরিবার সতীশ হাওয়ারের স্বপ্নের আবাসনে বসবাস করছে। বর্তমানে সতীশ হাওয়ারে ইহলোকে না থাকলেও তাঁর তৈরি আবাসনে গরিব মানুষগুলি এক নতুন মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়ে যায়।

বিদর্ভের প্রত্যন্ত এক গ্রামে সতীশের বড় হওয়া। যদিও কাজের সূত্রে তাঁর সম্মান অর্জন নবি মুম্বইতে এসে। প্রথমে একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ শুরু। পরবর্তীকালে তিনি ঠিক করেন নবি মুম্বইতে নিজস্ব একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবেন। 'হাওয়ারে বিল্ডার্স' নামে তিনি একটি ঠিকাদারি সংস্থা গড়ে তোলেন। এরপরই তিনি নিশ্চিত করেন সমাজের গরিব মানুষদের জন্য কিছু একটা করবেন। তাই খাড়গাড়ে বহুতল নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন। সতীশ হাওয়ারে তাঁর কাজের মাধ্যমে সমাজসেবাও করতে চেয়েছিলেন। কারণ সমাজের আর পাঁচটা মানুষ যখন নিজের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিতভাবে গড়ে তুলতে ব্যস্ত তখন এই সমস্ত মানুষকে নিয়ে তাদের ভাবার সময় কোথায়? কিন্তু সতীশ হাওয়ারে সেটাই করে দেখিয়েছেন। হাওয়ারে ফাউন্ডেশন বহুতল নির্মাণের পাশাপাশি শ্রমিকদের আয়ের সুযোগ করে দিয়েছে, বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে। তাদের শিশুদের স্কুলে যাওয়ারও বন্দোবস্ত করেছে।

সতীশ হাওয়ারের 'হাওয়ারে ফাউন্ডেশন' বর্তমানে ৬টি সিভিল কনস্ট্রাকশন বিষয়ক পড়াশোনা চালু করেছে রিয়েল এস্টেট অ্যাকাডেমিতে। যেখানে ছাত্রছাত্রীরা থিওরির পাশাপাশি প্রাকটিক্যাল ক্লাসও করে এই এক বছরের পাঠক্রমের মাধ্যমে। হাওয়ারে ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে খাড়গড়ে ইংরেজি এবং মারাঠী মাধ্যম স্কুলও গড়ে তোলা হয়েছে। সেখানে নামমাত্র খরচে এই সমস্ত নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েকে শিক্ষাদান করা হয়। লাইব্রেরি এবং পড়ার ঘরেরও সুবন্দোবস্ত করেছে হাওয়ারে ফাউন্ডেশন। আবার মহিলাদের স্ব-নির্ভর হওয়ার জন্য তারা বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছে। যেমন— কিছু সংখ্যক মহিলাকে সমবায় কল্যাণ পরিকল্পনার আওতায় কাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাঁপড় তৈরির কাজেও বহু সংখ্যক মহিলা যুক্ত হয়েছেন। সতীশ হাওয়ারে আজ নেই, কিন্তু তাঁর তৈরি সেবা প্রতিষ্ঠান এভাবেই সমাজের কাজে যুক্ত থেকে গেছে। যা সমাজের মানুষের কাছে সর্বকালের সেরা সেবা হিসেবে পরিগণিত হবে।

DAS STEEL UDDYOG

Naldubi, Mangalbari, Po.+Dist. : Malda

সকল প্রকার স্টীল ফার্ণিচার,
গ্রীলগেট এবং ফেব্রিকেশনের
কাজ করা হয়

Show Room

—ঃ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ—

GEETANJALI FURNITURE

Jhaljhalia, Station Road, Malda

Phone : 03512-266063,

Mobile : 9733387091

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833

3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

"আমাদের এই দেশের নাম, আমাদের এই মহান ধর্ম কি আমাদের কাছে এক মহাগৌরবের বিষয় নয়? — আনুগত্যপূর্ণ ভালবাসার এক চমৎকার পুরস্কার এবং কঠোর পরিশ্রমের এক স্বীকৃত ফলস্বরূপ নয়?"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

সাত রং চিকিৎসা

ডাঃ শিখা শর্মা

আমরা রংছাড়া কোনো কিছু কল্পনা করতেই পারি না। রং-হীন কিছু ভাবাই যায় না। রং মানুষের জীবনের সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছে। রং-য়ের জন্য কোনো বস্তুর সৌন্দর্য বিকশিত হয়। মানুষের শরীরের সঙ্গে সরাসরি রং-য়ের সম্পর্ক। প্রাচীনকালে রং-য়ের মাধ্যমে চিকিৎসা করা হোত। খাদ্যবস্তুর ওপর রঙিন আলো ফেলে বা রঙিন কাঁচের বোতলে জল রেখে রোদে দিয়ে ঔষধীয়গুণ নির্মাণ করে চিকিৎসা করার পদ্ধতি আছে। এগুলি ভারতের পরম্পরাগত চিকিৎসা। এখন আবার ধীরে ধীরে ইন্দ্রধনুষ অর্থাৎ সাতরঙা চিকিৎসা খুবই জনপ্রিয় হতে শুরু করেছে। প্রতিটি রং-য়েরই গুণ আছে, শরীরের এক একটি চক্রে এক একরকম প্রভাব সৃষ্টি করে। রং-চিন্তাভাবনার ওপর প্রভাব সৃষ্টি করে। রং-চিকিৎসায় যদি কেউ ক্লান্তি অনুভব করেন তবে তাঁকে হলুদ অথবা লাল রং দেখার পরামর্শ দেওয়া হয়। পুষ্টি বিজ্ঞানীরাও আজকাল খাদ্যবস্তুর মধ্যে সাতটি রং (বে-নী-আ-স-হ- ক-লা) থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন।

 বেগুনী রং সহস্রচক্রের সঙ্গে সম্পর্কিত। শরীরের উচ্চস্থানে অধিষ্ঠান। বেগুনী রং জ্ঞানের প্রতিনিধিত্ব করে। বেগুন-জাতীয় সবজি এই পর্যায়ে পড়ে।

 নীল রং আজ্ঞা চক্রের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং পূর্বাভাস অনুমানের শক্তি বৃদ্ধি করে। জাম ও জলপাই এই পর্যায়ের ফল। ঔষধীয় গুণে ভরপুর।

 আকাশি রং কণ্ঠচক্রে অধিষ্ঠান করে। আকাশ ও জলের সঙ্গে সম্পর্কিত। মানুষের শরীরের দুই তৃতীয়াংশ ভাগই জল। সেজন্য এই রং মানব শরীরের সঙ্গে সরাসরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। ব্লু বেরিজ জাতীয় ফল এই পর্যায়ের। এগুলি পোলিফেনোলে ভরপুর থাকে। ক্যানসার থেকে রক্ষা করে।

 সবুজ রং হৃদয়চক্রে অধিষ্ঠান করে। মানুষের শরীরের জন্য এই রং প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন পড়ে। সুস্বাস্থ্যের প্রতীক এই রং। এর প্রভাবে স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজনা কম হয়ে আরাম বোধ হয়। সবুজ রংয়ের প্রভাবে মানুষ প্রাণবন্ত থাকে। সবুজ পাতাযুক্ত তরিতরকারিতে অধিকমাত্রায় এই রং পাওয়া যায়। সবুজ সবজিতে ভিটামিন এ, সি, বি কমপ্লেক্স এবং ক্যালসিয়াম ও অন্য খনিজ পাওয়া যায়।

 হলুদ রং মণিপুরচক্রে অধিষ্ঠান করে। নতুন কর্মপ্রেরণা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্যোতক এই রং। সাধারণত খেলাধুলো অথবা খেলোয়াড়দের সঙ্গে যুক্ত এই রং। শারীরিক ও মানসিক শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে এই রং। হলদি, হলুদ সরষে, ভুট্টা ও আনারস এই পর্যায়ের খাদ্যদ্রব্য। হলুদ রংয়ের খাদ্য পদার্থে শরীরে রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। ভিটামিন বি কমপ্লেক্স এই জাতীয় খাদ্যবস্তুতে প্রচুর পরিমাণে থাকে। পাচকরস (ব্রোমিলেন) উৎপন্নকারী। হাঁপানি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি হলুদ রংয়ের খাদ্যদ্রব্য ব্যবহারে উপকার পাবেন।

 কমলা রং স্বাধিষ্ঠানচক্রের সঙ্গে সম্পর্কিত। শক্তি ও গাম্ভীর্যের প্রতীক। স্বাধিষ্ঠানচক্র মানুষের ভাবনা ও শরীরে জলের মাত্রার ভারসাম্য বজায় রাখে। সোডিয়াম ও পটাশিয়াম জাতীয় খনিজ লবণ এই চক্রকে প্রভাবিত করে। শরীরে এর ভারসাম্য নষ্ট হলে মানসিক উত্তেজনা বেড়ে যায় এবং বৃক্ক (কিডনি)-র কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। কমলালেবু, আতা, হলুদ গাজর এই পর্যায়ের খাদ্যবস্তু। এগুলির মধ্যে আলফা ক্যারোটিন, বিটা ক্যারোটিন এবং হেস্পেরেডিনের মতো ভিটামিন থাকে। উচ্চ রক্তচাপের ব্যক্তি এই জাতীয় খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করলে উপশম হবে।

 লাল রং মূলাধারচক্রের সঙ্গে সম্পর্কিত। ক্ষুধা ও কর্মপ্রেরণার ভিত্তি। শরীরের শক্তিসামর্থ্যের প্রতিনিধিত্ব করে এই রং। যখন মানুষ খুব বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন মূলাধারচক্রের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে বুঝতে হবে। টমেটো, গাজর, স্ট্রবেরি, তরমুজ, লাল সিমলা লঙ্কা, চেরি, আপেল ও বেদানা-সহ লাল রংয়ের সমস্ত খাদ্যবস্তুর এই পর্যায়ের মধ্যে পড়ে। টমেটোর মধ্যে লাইকোপিন থাকায় ত্বক সুন্দর রাখতে সাহায্য করে।

মানুষ যদি প্রতিদিন খাবারের থালায় সাত রং-য়ের খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে তাহলে শরীরের উজ্জ্বলতা বেড়ে যাবে। পুষ্টিগুণে ভরপুর নানা রং-য়ের ফল ও সবজি শরীরের সুরক্ষা কবচ তৈরি করে। মানুষের শরীরের সাতটি চক্র নির্দিষ্ট রং-য়ে প্রভাবিত হয়। সে বিষয়ে অল্পবিস্তর ধারণা নিয়েও খাদ্যদ্রব্য নির্বাচন করলে সুস্থভাবে জীবন অতিবাহিত করা যাবে।

(লেখক একজন পুষ্টি বিশেষজ্ঞ)

বালাসাহেব দেশপাণ্ডের জন্মশতবর্ষ পালন

বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা বালাসাহেব দেশপাণ্ডের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে গত ১৯ ডিসেম্বর ত্রিপুরার আগরতলার রবীন্দ্রভবনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল পি বি আচার্য, কল্যাণ আশ্রমের সর্বভারতীয় যুগ্ম সম্পাদক অতুল জোগ-সহ এক ঝাঁক কর্মকর্তা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল সারাদেশে চলা বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি আহ্বান জানান, বনবাসী সম্প্রদায়ের জন্য যারা এমন কাজ করছে তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার। সর্বভারতীয় যুগ্ম সম্পাদক অতুল জোগ ৫৩ হাজার গ্রামে জনজাতি সম্প্রদায়ের জন্য যে কাজ চলছে তার খতিয়ান তুলে ধরেন। প্রায় ৫০০ জন কর্মকর্তা এবং কয়েক হাজার শুভানুধ্যায়ীর উপস্থিতিতে ঐতিহ্যশালী ত্রিপুরী এবং রিয়াঙ্গ নৃত্য অনুষ্ঠানে এক নতুন মাত্রা যোগ করে।

সংস্কৃতভারতীর সম্মেলন

গত ৭ ডিসেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপ বাসন্তী ময়দানে বিশাল সংস্কৃত সম্মেলন হয়। কাকদ্বীপে সংস্কৃতভারতী আয়োজিত প্রথম সংস্কৃত সম্মেলনে

সমাবেশ সমাচার

সংস্কৃতপ্রেমী নাগরিকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে সম্পূর্ণ সম্মেলন পরিচালিত হয়। ছাত্রছাত্রীরা নৃত্য, সংস্কৃত ভাষায় নাটক, গীত পরিবেশন করে দর্শকদের মুগ্ধ করে। সম্মেলনে বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী বিজয়কৃষ্ণ দাস, কাকদ্বীপ হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা পূরবী দাস, শিক্ষক রামশঙ্কর নন্দ ও অধ্যাপক সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধান বক্তা ছিলেন সংস্কৃত ভারতীর প্রণব নন্দ।

গত ১৪ ডিসেম্বর নবদ্বীপে বঙ্গ বিবুধ জননী সভাগারে সংস্কৃত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রছাত্রীরা সংস্কৃতে গান নাটক ইত্যাদি প্রদর্শন করে। বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট অধ্যাপক কুমারনাথ ভট্টাচার্য ও সংস্কৃত ভারতীর দক্ষিণবঙ্গের সম্পাদক পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য।

গত ১৪ ডিসেম্বর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুকে মহাপ্রভু মন্দির সংলগ্ন সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হয় সংস্কৃত সম্মেলন। সম্মেলনে বহু সংস্কৃতপ্রেমী নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক তথা বিধায়ক ব্রহ্মময় নন্দ, অধ্যাপক প্রণব বাহুবলীন্দ্র, অধ্যাপক সুদর্শন বেরা ও অধ্যাপক পরমেশ আচার্য। প্রধান বক্তা ছিলেন অধ্যাপক কাশীনাথ নন্দী। গত ১৭ ডিসেম্বর উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয় সংস্কৃত সম্মেলন। বসিরহাট সংস্কৃত সম্মেলন সমিতি আয়োজিত সংস্কৃত সম্মেলনে সংস্কৃতপ্রেমী মানুষের উপস্থিতিতে স্থানীয় জনমানসে সংস্কৃতময় বাতাবরণের পরিবেশ তৈরি হয়। প্রায় ৩ ঘণ্টা ব্যাপী কার্যক্রম সংস্কৃত ভাষায় পরিচালিত হয়। নৃত্যগীত, নাটক, যোগাসন ইত্যাদির প্রদর্শন দর্শকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ। বক্তা ছিলেন মানবাধিকার কমিশনের বসিরহাট শাখার সভাপতি গৌতম চক্রবর্তী, কামারপুকুর হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক বিষ্ণুপদ সরকার, বসিরহাট টাউন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ড. যোগেশ ঘোষ, শিক্ষক নিবাস দাস ও সংস্কৃত ভারতীর প্রণব নন্দ, পরিচালনা করেন বসিরহাট হাইস্কুলের সংস্কৃত শিক্ষক।

শ্রদ্ধানিধি

গত ১১ ডিসেম্বর উত্তর মালদা জেলার কলিগ্রাম বগচরা গ্রামের স্বয়ংসেবক তথা সঙ্ঘের প্রাক্তন প্রচারক বর্তমানে চাঁচল বিবেকানন্দ শিশুমন্দিরের আচার্য উত্তম দাসের মায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে তাঁর বড়দা তপন কুমার দাস ও ভাই গৌতম দাস শ্রাদ্ধনিধি দান করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর মালদা জেলা প্রচার প্রমুখ উজ্জ্বলকুমার দাসের হাতে। এদিন এলাকার গরিব ও দুঃস্থদের ৩০টি কম্বল দান করেছেন উত্তম দাসের পরিবার। শ্রাদ্ধবাসরে প্রাক্তন জেলা কার্যবাহ-সহ বহু স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

শোকসংবাদ

বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়ার স্বয়ংসেবক, বর্তমানে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বাঁকুড়া বিভাগ সম্পাদক বলরাম সাঁতরার পিতৃদেব গত ৫ ডিসেম্বর বড়জোড়ার নতুনগ্রামের বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তিনি ৩ পুত্র ও পুত্রবধূ, ২ কন্যা ও জামাতা এবং নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

***

গত ১৭ ডিসেম্বর নারায়ণ পোদ্দার ৮১ বছর বয়সে ব্যারাকপুরে নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেছেন। বাল্যকাল থেকে স্বয়ংসেবক ও স্বস্তিকার একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন। দুই পুত্র ও স্ত্রীকে রেখে যান। তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক রাধাগোবিন্দ পোদ্দারের সেজদাদা।

***

হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া নগরের যদুবেড়িয়া শাখার স্বয়ংসেবক বিশ্বজিৎ দাসের পিতৃদেব ধীরেন্দ্রনাথ দাস গত ১০ ডিসেম্বর দুপুরে ৭৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি স্ত্রী, এক পুত্র, দুই কন্যা এবং নাতি-নাতনি রেখে গেছেন।

উত্তরবঙ্গ সেবা ভারতী ও বিবেকানন্দ সেবা ট্রাস্টের সেবা প্রদর্শনী

উত্তরবঙ্গ সেবা ভারতী ও বিবেকানন্দ সেবা ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনায় গত ৩০ নভেম্বর কোচবিহার নগর পাটাকুড়া সারদা শিশুতীর্থ অনাদি ভবনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সেবা বিভাগের তত্ত্বাবধানে একটি সেবা প্রদর্শনী এবং বিনামূল্যে অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, ফিজিওথেরাপি, ধুবরী থেকে আগত চিকিৎসকদের দ্বারা নিউরোথেরাপি, মালদা থেকে আগত ডাঃ পঙ্কজ বিশ্বাস চুম্বক থেরাপির মাধ্যমে চিকিৎসা করে দেখান। রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ের ব্যবস্থা ছিল। শিলিগুড়ি বিধাননগরের ভিমবার অন্ধ বিদ্যালয়ের প্রতিবন্ধী শিশুরা সমবেত নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশন করে সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। অনুষ্ঠানের বিশিষ্ট অতিথি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক সুনীলপদ গোস্বামী তাঁর বক্তব্যে বলেন, প্রতিবন্ধী ভাইবোনেরা অক্ষম নয়— তারাও সক্ষম। উপস্থিত ছিলেন সেবা ভারতীর সচিব সুনীল শাহ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক গোবিন্দ ঘোষ-সহ সেবা প্রমুখ গৌতম মণ্ডল, উত্তরবঙ্গ সেবা ভারতীর সভাপতি কুলছত্রপ্রসাদ আগরওয়াল-সহ কার্যকর্তাবৃন্দ। পার্বতীচরণ চৌধুরী ও ডাঃ মণীন্দ্রনাথ পালকে বিশেষ ভাবে সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানে মোট ২৭ জন ভাইবোনদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। তাঁদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন বিপদতারণ দাস ও শ্যামল দেব। অনুষ্ঠানে জৈব সারের প্রয়োগ ও হস্তশিল্পের প্রদর্শনী রাখা হয়। উদ্বোধনী ভাষণে অনুষ্ঠানের বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন উত্তরবঙ্গ সেবাপ্রমুখ অজিত পাল। সঙ্ঘের জেলা কার্যকর্তা জগদীশ কার্যী সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের বৈঠক

গত ৭ ডিসেম্বর রবিবার দিনহাটা মদনমোহন পাড়া সারদা শিশুতীর্থে বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা সভাপতি বিদ্যুৎ মজুমদার, রাজ্য কমিটির সদস্য ইন্দ্রমোহন রাভা। পৌরোহিত্য করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নগর সঙ্ঘচালক কল্যাণ পাল।

সভা পরিচালনা করেন দিনহাটা মহকুমা সভাপতি দেবব্রত ঘোষ। ৫২ জন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

দুর্গাপুরে সেবাভারতীর কম্বলদান

প্রতি বছরের মতো এবছরও শীতকালে কম্বলদান অনুষ্ঠান হয় সেবা বিভাগের পরিচালনায় দু'টি স্থানে। ইছাপুর ও নগরের ২৩নং ওয়ার্ডে সেই কম্বল দান করা হয় বিশিষ্ট ব্যক্তির মাধ্যমে। উল্লেখযোগ্য ইছাপুর গ্রামের অনুষ্ঠানে দুর্গাপুরের একটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক উপস্থিত থেকে উৎসাহিত হয়ে কম্বলের সঙ্গে একটি করে মিষ্টির প্যাকেট দেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে প্রান্ত সেবা প্রমুখ মনোজ চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামী বিভূতিভূষণ সরকারের জন্মশতবার্ষিকী

স্বাধীনতা সংগ্রামী ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শুভানুধ্যায়ী স্বর্গীয় বিভূতিভূষণ সরকারের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান গত ১১ ডিসেম্বর তাঁর জন্মস্থান হুগলী জেলার ভুঁয়েড়া গ্রামে হয়। তিনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সহযোগী ও ভারত সরকারের তাম্রপদকপ্রাপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রামী। তাঁর নামাঙ্কিত সেবা পরিষদ এই অনুষ্ঠানে আয়োজন করে। তিন দিন ব্যাপী আয়োজিত জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে ১৩ ডিসেম্বর বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, ১৪ ডিসেম্বর গ্রামের ছেলেমেয়েদের নিয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পরে বিজয়ী প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠান উপলক্ষে বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির সহযোগিতায় নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবিরে ৩৫০ জন পরিষেবা গ্রহণ করে। স্বাস্থ্য শিবিরে হৃদরোগ, অস্থিরোগ এবং ইসিজির ব্যবস্থা ছিল। উল্লেখ্য, বিভূতিভূষণ সরকার সেবা পরিষদের উদ্যোগে প্রতি রবিবার দাতব্য চিকিৎসা ও সপ্তাহে তিন দিন ফ্রি-কোচিং সেন্টার চালানো হয়। পরিষদ প্রতিবছরই চক্ষু ও স্বাস্থ্য শিবির আয়োজন করে।

কুটুম্ব প্রবোধন সভা

গত ৭, ৮ ডিসেম্বর রবিবার ও সোমবার উত্তরদিনাজপুর জেলা সঙ্ঘের দৃষ্টিতে ঈশ্বরপুর জেলায় দুটি স্থানে কুটুম্ব প্রবোধনের এক অলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করেন লক্ষ্মী সিনহা। সভায় ২৯ জন উপস্থিত ছিলেন। হিন্দু জীবন পদ্ধতি, আদর্শ হিন্দু পরিবার, হিন্দু মায়েদের সংস্কারিত জীবন সন্তান নির্মাণের মায়েদের অবদান, আদর্শ-মা, সমাজ গঠনে মায়েদের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়। জীজামাতা, লক্ষ্মীবাই ও মা সারদার জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করে বিদেশি সংস্কৃতি থেকে মুক্ত থাকার কথাও বৈঠকে আলোচনা হয়। একইভাবে ঈশ্বরপুর শহরে একটি কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেও বিশিষ্ট পরিবার থেকে ১৪ জন মায়েরা উপস্থিত ছিলেন। উভয় কার্যক্রমে সুচিন্তিত মত ব্যক্ত করেন উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কুটুম্ব প্রবোধনের প্রমুখ মটুকেশ্বর পাল।

মঙ্গলনিধি

গত ৯ ডিসেম্বর কলকাতা দমদম রোডের বাসিন্দা আর্ভিন মিত্র ও শুভ-লক্ষ্মীর শুভ বিবাহ অনুষ্ঠানে শ্রীমিত্র হিন্দু জাগরণ মঞ্চের কাজের জন্য মঙ্গলনিধি প্রদান করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক কেশবরাও দীক্ষিতের হাতে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বনাথ সাহা, রঞ্জন ভুঁইয়া প্রমুখ।

***

উত্তর মালদা জেলার রতুয়াখণ্ডের কমলপুর শাখার স্বয়ংসেবক সুফল সিংহ তাঁর পুত্রের শুভ বিবাহের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে গত ১৪ ডিসেম্বর মঙ্গলনিধি প্রদান করেন জেলা প্রচারক মথুরা হেঁসের হাতে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলার বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক।

***

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর মুর্শিদাবাদ জেলা সঙ্ঘচালক শুকদের ভকত তাঁর পুত্রের শুভবিবাহের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সহ সেবা প্রমুখ গৌতম মণ্ডলের হাতে। অনুষ্ঠানে অনেক স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

***

গত ২৯ নভেম্বর কলকাতা মহানগরের প্রতাপাদিত্য নগর শারীরিক প্রমুখ বিপুল হালদারের শুভ বিবাহের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে তাঁর বাবা পাঁচুগোপাল হালদার মঙ্গলনিধি প্রদান করেন সমাজ সেবা ভারতী পশ্চিমবঙ্গের প্রাদেশিক সম্পাদক সন্দীপ পালের হাতে।

অনুষ্ঠানে বাঁশদ্রোণী প্রভাত শাখার স্বয়ংসেবক এবং কার্যকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

***

হাওড়া গ্রামীণ জেলার কালিনগর খণ্ড কার্যবাহ প্রবীণ চক্রবর্তী তাঁর ভগিনীর শুভ বিবাহ উপলক্ষে গত ১২ ডিসেম্বর বিবাহ বাসরে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা ব্যবস্থা প্রমুখ-সহ অন্যান্য কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক।

হকি এবং পঙ্কজ আডবানীই বছরের সেরা প্রাপ্তি

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজনীতির পালাবদল কিন্তু ভারতের ক্রীড়া সংস্কৃতিতে তেমন একটা প্রভাব ফেলতে পারেনি। আন্তর্জাতিক ক্রীড়াবৃত্তে যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থারও হেরফের হয়নি। বরঞ্চ গতবারের কমনওয়েলথ গেমস ও এশিয়াডের তুলনায় এবারের পারফরমেন্স যথেষ্ট ম্যাড়মেড়ে। ব্যতিক্রম দু'একটি বিভাগ, যেখানে খানিকটা হলেও সোনালি স্বপ্নের দিকচক্রবাল বিবৃত হয়েছে। তবে এবছরে বড় মুখ করে বলার মতো ঘটনা হকির নবজাগরণ। সিনিয়র-জুনিয়র দু'টি দলই বৃহৎ মঞ্চে ভারতের

ঐতিহ্যকে খানিকটা হলেও ফিরিয়ে আনতে পেরেছে। এর সঙ্গেই বলতে হয় ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে পঙ্কজ আডবানী ও কিদাম্বি শ্রীকান্তের কথা। দু'জনের মধ্যে পঙ্কজের কাছে এই মাত্রার পারফরমেন্স প্রত্যাশিতই ছিল। কিদাম্বি শ্রীকান্ত সে তুলনায় অখ্যাত, অনভিজ্ঞ খেলোয়াড় হিসেবে যে চমক দেখিয়েছেন, তা ভারতীয় ব্যাডমিন্টনে বড়সড় বিপ্লব এনে দিতে পারে। আর বলতে হয় স্কোয়াসে সৌরভ ঘোষালের কথা। প্রায় একার হাতে পাকিস্তানের জিম্মা থেকে স্কোয়াসের সুদীর্ঘলালিত ঐতিহ্য ও গরিমাকে কেড়ে নিয়ে ভারতের মাথায় তুলে দিয়েছেন।

ন'বারের অলিম্পিক হকির সোনাজয়ী ভারত আগামী রিও'র অলিম্পিকে পদক জেতার বড় দাবিদার হিসেবে উঠে এসেছে। এবছর ইনচিওন এশিয়াডে ১৬ বছর পর হকির সোনা পুনরুদ্ধার করাই শুধু নয়, বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়াকে তাদের মাঠে টেস্ট সিরিজে হারিয়ে এসেছে অনেক বেশি প্রাধান্য নিয়ে খেলে। এরপর চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতেও সর্দার সিংহের দল মনে রাখার মতো হকি খেলেছে। কিন্তু সেমিফাইনালে ভারত-পাকিস্তানের মুখোমুখি হলেও ফাইনালে উঠতে এবারও ব্যর্থ ভারত। পাকিস্তানের কাছে ৪-৩ গোলে পরাজিত হয়ে ট্রফি থেকে বিদায় নিতে হলো। দু-মাস আগে মালয়েশিয়ার মাঠে পরপর তিন বড় দল অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান ও গ্রেট বৃটেনকে হারিয়ে সুলতান জোহর কাপ জিতে হকি প্রেমীদের হৃদয়ের প্রাণস্পন্দন বাড়িয়ে দিয়েছিল। চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ঘরে আনতে না পারলেও এই দলটিকে ঘিরে স্বপ্নের জাল বোনা শুরু হয়ে গেছে।

এবছর বিলিয়ার্ডস ও স্নুকারে বিশ্ব খেতাব জিতে 'গ্রান্ড ডবল' করেছেন পঙ্কজ আডবানী। প্রতি বছর হয় টাইম ফর্ম্যাট কিংবা পয়েন্ট ফর্ম্যাটে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়া জলভাত করে ফেলেছেন পঙ্কজ। আর 'গ্রান্ডডাবল' এবছরটা নিয়ে তিনবার হয়ে গেল। সবমিলিয়ে ১২টি বিশ্ব খেতাব তার সঙ্গে বাড়ির ক্যাবিনেটে শোভা পাচ্ছে এশিয়ান গেমসের সোনা-সহ অজস্র আন্তর্জাতিক পদক। তার একমাত্র অধরা স্বপ্ন কিংবদন্তী মাইক রাসেলের ১৭টি বিশ্ব খেতাব। তাও হয়ে যাবে অদূর ভবিষ্যতে। ব্যাডমিন্টনের কিদাম্বি শ্রীকান্তও লম্বা রেসের ঘোড়া হয়ে উঠতে চলেছেন। শ্রীকান্ত বিশ্ব ব্যাডমিন্টনের অজেয়শক্তি চীনকে বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন ব্যাডমিন্টনটাও ভারতীয়রা যথেষ্ট ভালোই খেলেন। চীনের মাটিতে দাঁড়িয়ে চীনের প্রাচীরে ফাটল ধরিয়ে প্রিমিয়র টুর্নামেন্ট জেতাটা যে কতবড় কীর্তি তা বিচার করবে ভাবীকাল।

যে টুর্নামেন্টটা লিয়েন্ডার পেজ ও মহেশ ভূপতি জুটি তিনবার অদম্য প্রচেষ্টা চালিয়েও জিততে পারেননি, তা কিনা সানিয়া মির্জা প্রথমবার খেলতে নেমেই করায়ত্ত করেছেন। অঘোষিত বিশ্ব টেনিসের চ্যাম্পিয়নশিপে মহিলাদের ডাবলসে জিম্বাবোয়ের ক্লাবাব্লাককে সঙ্গী করে অসাধ্যসাধন করেছেন বলা চলে। মিক্সড ডাবলসে সোনার পদকের মূল্যও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এশিয়াডে মহিলা বক্সিংয়ে মেরি কমের লড়াই ভারতীয় সমাজমানসে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে। জীবিত অবস্থাতেই মেরি কম 'মিথ' হয়ে উঠেছেন। সেই 'মিথ'-এ আরো একটু রঙ চড়িয়েছেন মেরি মহার্ঘ সোনাটি জিতে।

এশিয়াডে সোনার ছেলে অবশ্যই কলকাতার মাছ-ভাত খাওয়া বঙ্গসন্তান সৌরভ ঘোষাল। সৌরভ পাকিস্তানের বড় গর্বের 'তাজটি' সিংহবিক্রমে হস্তগত করেছেন। স্কোয়াস ও পাকিস্তান একপ্রকার সমার্থকই থেকেছিল দীর্ঘকাল। পাকিস্তান ও মালয়েশিয়ার মতো বড় শক্তিকে হার মানিয়ে এশিয়ান গেমসে স্কোয়াসের বিজয়মঞ্চে ভারতকে তুলে ধরে নতুন বার্তা দিয়েছেন। শুধু এশিয়াড নয় বৃহত্তর বিশ্বমঞ্চেও ভারত এক নবোদিত শক্তি হিসেবে উঠে আসতে চলেছে। এশিয়াডে কুস্তিতে প্রত্যাশা অনুযায়ী ফল না হলেও কমনওয়েলথ গেমসে কিন্তু কুস্তিগীররা ভারতকে চরম হতাশা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন অনেকগুলো পদক তুলে। তাদের সঙ্গে সমানতালে পাল্লা দিয়ে পদক তুলেছেন শুটাররাও।

এশিয়াডে কিন্তু শুটাররাও আপাত ব্যর্থ। অথচ অলিম্পিকে শুটিং ও কুস্তিই ভারতের প্রধান আশা-ভরসার কেন্দ্র। রিও অলিম্পিকে যে টার্গেট নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ সব মিলিয়ে দশটি পদক জেতা, তার জন্য কুস্তি ও শুটিং ইভেন্টে বাড়তি মনোযোগ দিতে হবে।

শব্দরূপ-৭৩২ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

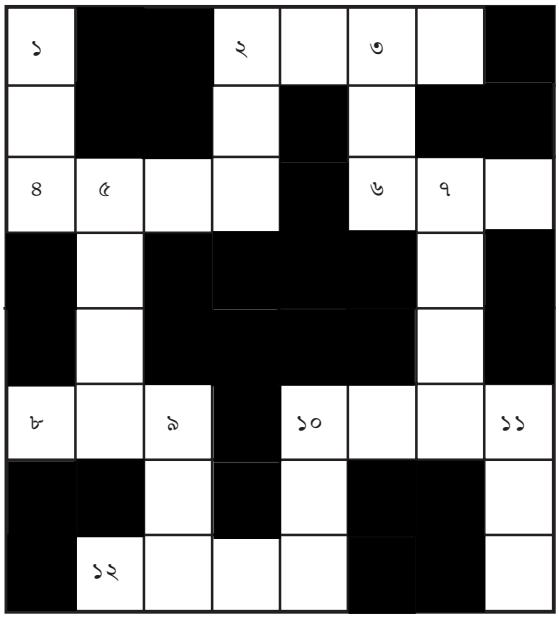

সূত্র :

পাশাপাশি : ২. এঁর নিদ্রা ভুবন-বিখ্যাত!, ৪. দেহ, শরীর, ৬. মা গঙ্গার বাহন, ৮. কশ্যপ পত্নী; অরুণ ও গরুড়ের জননী, ১০. যে ছন্দের দুই চরণের শেষে অক্ষরের মিল আছে, ১২. পাত্র ও পাত্রীকে শেষবার দেখিয়া আশীর্বাদ এবং বিবাহ স্থির করা।

উপর-নীচ : ১. বিরাট, রাজার শ্যালক, ২. যক্ষরাজ; মহাধনী, ৩. পা; পদক্ষেপ; ঘোড়ার গতি, ৫. যাহার জিহ্বা লকলক করে ('—অগ্নিশিখা'), ৭. যশোহর জেলার একটি নদ; মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের স্মৃতি-বিজড়িত, ৯. রাক্ষসী বিশেষ; মারীচের জননী (রাম কর্তৃক নিহত), ১০. 'উড়ন্ত শিখ' নামে খ্যাত দৌড়বীর, ১১. মাঘ মাসের কৃষ্ণ-চতুর্দশী।

সমাধান
শব্দরূপ-৭২৯
সঠিক উত্তরদাতা

সদানন্দ নন্দী
লাভপুর, বীরভূম
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

কৌ	শি	ক	■	কৌ	মো	দ	কী
ল	■	ব	ক্তা	র	■	■	■
■	অ	ন্ধ	■	ব	হ্বা	র	ম্ভ
■	গ্র	■	■	■	■	ক্ত	■
■	দা	■	■	■	■	বী	■
ক	নী	নি	কা	■	গ	জ	■
■	■	■	নী	বা	র	■	গো
গো	ব	র্ধ	ন	■	ব	শি	ষ্ঠ

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

□ ৭৩২ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৬ জানুয়ারি ২০১৫ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

□ ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।

□ যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।

□ চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।

□ ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।

□ পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।

□ গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।

□ স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।

□ লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

□ রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

□ লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা।। বান্দা বৈরাগী।। ৯

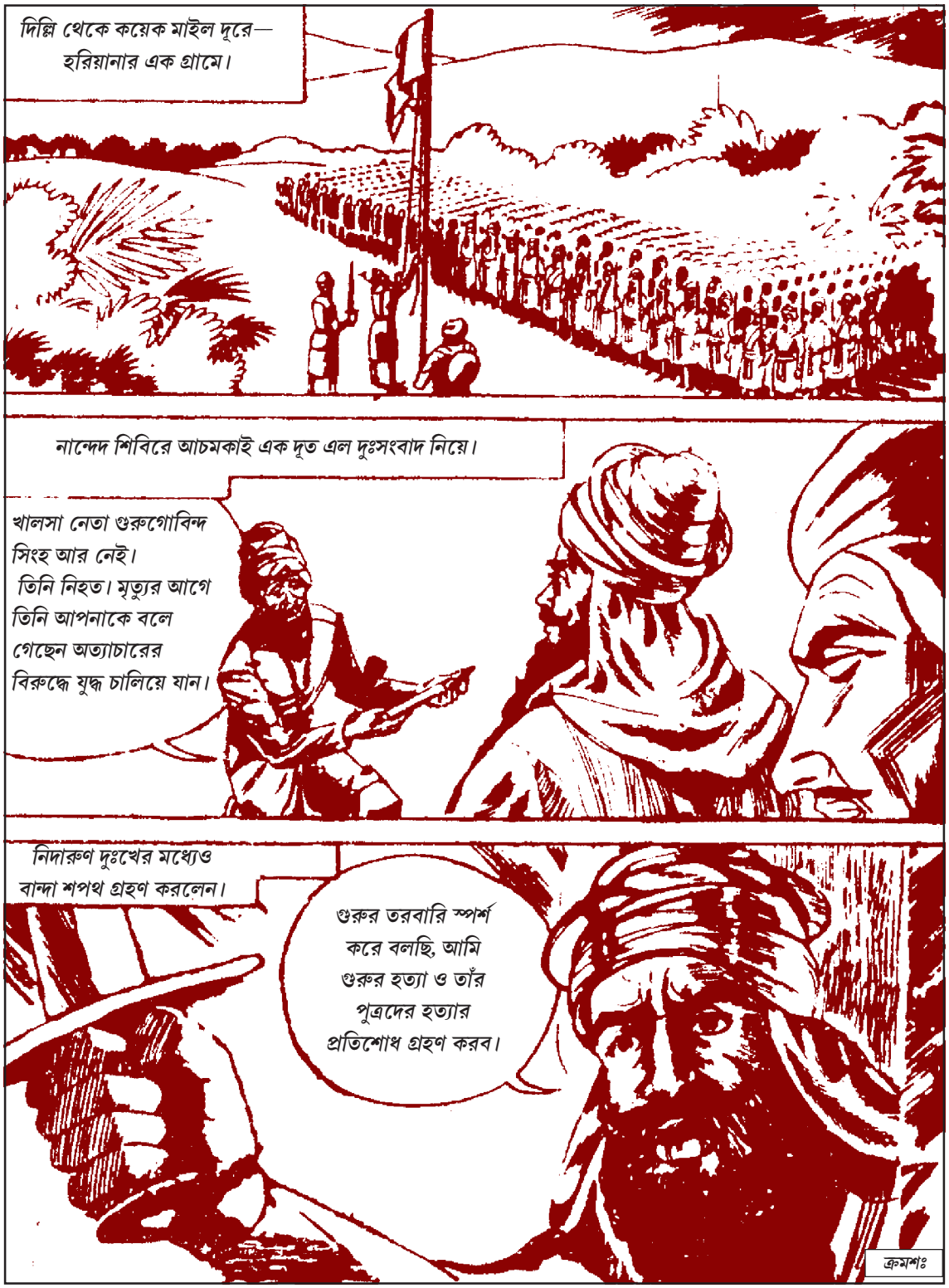

এই সময়
সংবাদপত্র
YOUNG BENGAL GLOBAL BENGALI
২৬ অগ্রহায়ণ ১৪২১ শুক্রবার ১২ ডিসেম্বর ২০১৪ শহর সংস্করণ

এই সময় ব্যালট বক্স
কী ভাবছেন আপনি? জানতে চায় এই সময়। ভোট দিয়ে জানান আপনার মত
বঙ্গ রাজনীতিতে উন্নয়নের চেয়ে কি নন-ইস্যুই বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে?
▶ হ্যাঁ ▶ না ▶ জানি না
কালকের ফলাফল
আরএসএস-এর ধর্মান্তকরণ সমর্থনযোগ্য?
হ্যাঁ ৭৪% | না ২৩% | মন্তব্য নয় ৩%
মতামত জানাতে লগ-ইন করুন
www.eisamay.com

পরাবর্তনের পক্ষে ৭৪ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ১১ ডিসেম্বর ‘এই সময়’ (টাইমস্ অফ ইন্ডিয়ার বাংলা দৈনিক) সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রাত্যহিক ব্যালট বাক্সের বিষয়বস্তু বহু মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইদানীংকালের অন্যতম বহুচর্চিত বিষয় নিয়ে জনসাধারণের মতামত এই অংশে প্রতিফলিত হয়। আর এস এস (রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ)-এর ধর্মান্তকরণ (পড়ুন পরাবর্তন) আপনি সমর্থন করেন? —ছিল সেদিনের ভোটিং-এর বিষয়। ইন্টারনেটের বৈদ্যুতিন ভোটিং চলে প্রায় রাত পর্যন্ত। পরদিন ‘এই সময়’-এ প্রকাশিত ফল অনুযায়ী সমর্থনে ৭৪ শতাংশ ভোট পড়ে। সোস্যাল নেটওয়ার্কিং ওয়েবসাইটগুলিতে এই খবর আশাতীত সাড়া ফেলে। আজকের সমাজ ‘সোস্যাল নেটওয়ার্ক’-এর সঙ্গে সহমত বলেই মনে করেন বহু বিদগ্ধজন।

বাগনানে সরকারি সাধারণ বিদ্যালয়ে ‘মুসলিম হোস্টেল’ তৈরির চেষ্টা

সংবাদদাতা॥ হাওড়া জেলার বাগনান থানার অন্তর্গত বাইনান গ্রামে ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি সরকার অনুমোদিত সাধারণ বিদ্যালয়ের নাম বাইনান বামনদাস উচ্চ বিদ্যালয় (উঃ মাঃ)। সেখানে সকল সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীরাই পড়াশোনা করে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘু

বাইনান বামনদাস উচ্চ বিদ্যালয়।

উন্নয়ন দপ্তরের অর্থে হাওড়া জেলা পরিষদের মাধ্যমে এই স্কুলে একটি ‘মুসলিম হোস্টেল’ তৈরির প্রক্রিয়া চালু হয়েছে। এই খবর পাওয়ার পরেই বাইনানের প্রায় সাতশো গ্রামবাসী এই হোস্টেল তৈরির অপচেষ্টার বিপক্ষে গণস্বাক্ষর দেন। সেই গণস্বাক্ষরের কপি এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিভুদাস বোধক-এর কাছে বেশ কিছু হিন্দু গ্রামবাসী গিয়ে জমা দেন। প্রধান শিক্ষক সেই কপি জমা নিয়ে রিসিভ কপি গ্রামবাসীদেরও দেন এবং তিনি এই মর্মে স্কুলের প্যাডে লিখে স্বাক্ষর করেন যে, এই সাধারণ বিদ্যালয়ে শুধুমাত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পড়ুয়াদের জন্য হোস্টেল হলে স্কুলের পক্ষ থেকে আপত্তি আছে। কিন্তু যদি সকল সম্প্রদায়ের পড়ুয়াদের নিয়ে স্কুলে হোস্টেল হয় তাহলে স্কুলের আপত্তি থাকবে না।

এই গণস্বাক্ষরের প্রতিলিপি এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের লেখা এই কাগজের কপি গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে বাইনান গ্রাম পঞ্চায়েত, বাগনান বি.ডি.ও, ডি.এম. হাওড়া, এ.ডি.এম. (ডেভেলপমেন্ট) হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ দপ্তরের শিক্ষাদপ্তর, সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে— সাধারণ বিদ্যালয়ে এই ‘মুসলিম হোস্টেল’টির প্রক্রিয়া বন্ধ করার জন্য।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
29 December - 2014

SURYA

EVERY CITY EVERY HOME

The biggest Indian MultinatiOnal SURYA showcases the best of lighting solutions, unmatched range of fans and quality pipes that touches the live of people from EVERY CITY EVERY HOME

SURYA ROSHNI LIMITED

Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi-110008 (INDIA)
Tel. : +91-11-25810093-96 Fax : +91-11-25789560
Email : consumercare@sroshni.com Website : www.surya.co.in

দাম : ১০.০০ টাকা